নির্বাক যুগের ছায়ালোকের কথা

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

অরুণা প্রকাশন
২ কালিদাস সিংহ লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৮৫

অরুণা প্রকাশনের পক্ষে শ্যামলকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক
২ কালিদাস সিংহ লেন কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ সৌম্যেন পাল

বর্ণসজ্জা অরুণা প্রিন্টার্স ২ কালিদাস সিংহ লেন কলকাতা ৯
মুদ্রক নিম্বার্ক অফসেট ৪এ পটলডাঙা স্ট্রিট কলকাতা ৯

চলচ্চিত্রপ্রেমীদের উদ্দেশে নিবেদিত হল

থিয়েটারের মতো সিনেমাও আমাদের দেশে পশ্চিম থেকে আমদানি করা হয়েছে। আমাদের দেশে থিয়েটারকে আশ্রয় করেন অনেক ভালো ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী, অনেক নাটক ও প্রহসন লেখা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলিই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেলেও আজ পর্যন্ত যেমন কোনো থিয়েটার কোম্পানি টেকেনি, সিনেমা সম্বন্ধেও অনেকটা সেই কথা বলা যেতে পারে। নির্বাক এবং সবাক যুগে অনেক ধনী এবং শিল্পপতিরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কোম্পানি করেছেন, বহু প্রতিভাবান অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন, এক-একখানা ছবি দেশের মধ্যে তুমুল হইচই তুলেছে, লক্ষ লক্ষ টাকা আমদানি হয়েছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, কোনো কোম্পানিও আজ অবধি টিকেছে কি? এ-প্রশ্নের সমাধান ইউরোপ আমেরিকায়ও এখনও হয়নি।

ভারতে ছায়াচিত্রশিল্প ইউরোপ বা আমেরিকার ছায়াচিত্রশিল্পের চাইতে অর্বাচীন হলেও এই প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস পাঁচশো বছরের ইতিহাসের মতোই বহুধা বিচিত্র। কারণ শুধু যে অনেক ধনী লোকই এই সিনেমার ব্যবসায়ে সর্বস্ব খুইয়েছেন তা নয়, বহু লোক বহু কার্য ছেড়ে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপেক্ষা করে এই সিনেমাবহ্নিতে পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে

নিজেদের সর্বনাশ করেছেন। কত বিরহবেদনা, কত বিচ্ছেদ ও মিলন, কত উত্থান ও পতন, কত দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে যে এই শিল্পতে— তার ইতিহাস সাধারণের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

এ-কথা নিশ্চিত, পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের সমাজের কাঠামো যা ছিল আজ তা নেই। আমাদের রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমাদের পোশাকে চালচলনে ও কথাবার্তায়ও পঞ্চাশ বছর আগেকার ঢং আর নেই। এ-কথা অনস্বীকার্য, সিনেমা এই পরিবর্তনের জন্য অনেকখানি দায়ী এবং কতখানি দায়ী তা ঐতিহাসিকরা বিচার করবেন।

খুব সম্ভব ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বায়োস্কোপ প্রথম আসে। লন্ডন বায়োস্কোপ নাম দিয়ে শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন নামে একজন বাঙালি একটি বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর কোম্পানি খোলেন। সেন মহাশয় কোনো জায়গায়, প্রেক্ষাগৃহে কিংবা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে বায়োস্কোপ দেখাবার কোনো পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করেননি। লোকের বাড়িতে যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি যেমন বায়না করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আজও আছে, সে-সময় লন্ডন বায়োস্কোপ কোম্পানিকেও বায়না করে ডেকে নিয়ে যাওয়া হতো। কলকাতার অনেক বড়োলোকের বাড়িতে বিবাহাদি ও অন্যান্য উৎসবে লন্ডন বায়োস্কোপের আবির্ভাব হতো। বোম্বাইয়ের কথা বলতে পারি না, কিন্তু বাংলা দেশে বায়োস্কোপ দেখানোর কোম্পানি আর দ্বিতীয় ছিল না বলে বাংলা দেশের সর্বত্রই রাজা, মহারাজা, জমিদার এবং অন্যান্য বড়োলোকের বাড়িতে সেন মহাশয়ের

লন্ডন বায়োস্কোপ কোম্পানির ডাক পড়ত। বায়োস্কোপকে তখন জগতের অষ্টম আশ্চর্য বলা হতো। মধ্যে মধ্যে নাটক অভিনয়ের পরে থিয়েটারওয়ালারাও বায়োস্কোপ দেখাবার ব্যবস্থা করতেন।

তখনকার দিনের ছবি দৃশ্যপট ও ক্যামেরার কাজ ছিল আজকের দিনের তুলনায় অতি জঘন্য। বেশ মনে পড়ে, আধঘণ্টা ছবি দেখে এসে দু-ঘণ্টা চোখের সামনে আলো চকমক করতে থাকত। তা ছাড়া প্রোজেকশন যন্ত্রের একটা খড়খড় করে আওয়াজ চলতে থাকত ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত। আজকের দিনের সিনেমার তুলনায় সেদিনের বায়োস্কোপ দেখা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল নানা দিক দিয়ে। কিন্তু তা বললে কী হয়, ছবি চলছে, ফিরছে, পোশাক ছাড়ছে আবার পরছে, অর্থাৎ ছবির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে, এইটেই ছিল তখনকার দিনের বড়ো কথা। তখনকার দিনের ছবির বিষয়বস্তুও ছিল সব অদ্ভুতরকম। একটা লোক বাথরুমে ঢুকে কাপড় ছাড়ছে তো কাপড় ছাড়ছেই, যতবার কোট খুলে রাখছে ততবারই দেখা যাচ্ছে আবার সে কোট পরে দাঁড়িয়ে আছে। এক কোণে স্তূপীকৃত কোট-কলার-টাই জমা হয়ে গেল। শেষকালে লোকটা উপায় না দেখে জামা-জুতো-পেন্টুলুনসমেত বাথটবে লাফিয়ে পড়ল। আজকের দিনে লোক এর মধ্যে হাসির কোনো খোরাক না পেতে পারে, কিন্তু তখন এই দৃশ্য দেখেই দর্শকবৃন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে থাকত।

সে-যুগে আমেরিকান ফিল্মের চাইতে ফরাসি পাথে কোম্পানির ছবি এ-দেশে বেশি আসত। এ-দেশে দেশীয় রাজাদের রাজ্যের হাতি ঘোড়া উট প্রভৃতির শোভাযাত্রা,

সাপুড়েদের সাপের খেলা, বাঁদর ও রামছাগলের খেলা ও আরও অন্যান্য সাময়িক ছবি তুলে ইউরোপ, আমেরিকায় দেখাবার জন্য পাথে কোম্পানি তাঁদের ক্যামেরাম্যান পাঠাতেন। হীরালাল সেন মহাশয় খুব উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি একবার চেষ্টাচরিত্র করে এইরকম পাথে কোম্পানির এক ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন। বলা বাহুল্য, সে-সময় ইউরোপীয় কোনো কোম্পানির ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভাব করা বিশেষ শক্ত ব্যাপার ছিল, সেন মহাশয় ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে ভাব করে ছবি তোলবার প্রাথমিক ব্যাপারটা আয়ত্ত করে নিলেন।

এই সময় ক্লাসিক থিয়েটারে স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'আলিবাবা' অভিনীত হচ্ছিল। 'আলিবাবা' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বাজারের ফড়ে থেকে আরম্ভ করে বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মুখে পর্যন্ত 'আলিবাবা'র গান শুনতে পাওয়া যেত। হীরালালবাবু সময় বুঝে নিজের ক্যামেরা দিয়ে 'আলিবাবা'র কয়েকটি গানের দৃশ্যের ছবি তুলেছিলেন। এই ছবিগুলো মাঝে মাঝে থিয়েটারে দেখানো হতো। বলা বাহুল্য, এই ছবি দেখবার জন্য থিয়েটারে লোক ভেঙে পড়ত।

হীরালালবাবু লন্ডন বায়োস্কোপ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তিনি যেরকম উৎসাহী ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন, হয়তো ভবিষ্যতে স্টুডিয়ো করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্যপ্রকার। একদিন রাত্রে আগুন লেগে তাঁর জীবনব্যাপী পরিশ্রম ও সাধনালব্ধ ধন, ফিল্ম এবং ক্যামেরা ভস্মীভূত হয়ে গেল। সে-রাত্রের কথা বেশ মনে পড়ে। হঠাৎ

আমরা বাড়ি থেকে দেখলুম 'হেদো', অর্থাৎ আজ যার নাম হয়েছে 'আজাদ হিন্দ বাগ', সেই দিকের আকাশটা রাঙা হয়ে উঠল। দমকল ছুটল— পরদিন সকালে শুনতে পাওয়া গেল হীরালাল সেনের লন্ডন বায়োস্কোপ কোম্পানির গুদাম আগুনে শেষ হয়ে গেছে।

এর পরে সেন মহাশয় অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু লন্ডন বায়োস্কোপ কোম্পানি আর হল না। এই দিক দিয়ে তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি প্রথম ভারতীয় সিনেমার ছবি তোলেন। সেদিন মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে যে-প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল তার কর্তৃপক্ষরা অনেক চেষ্টা করেও হীরালালবাবুর একখানা ছবি জোগাড় করতে পারেননি।

১৯০৫ কি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিষচন্দ্র সরকার নামে আরেকজন বাঙালি ক্যামেরাম্যান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'অ্যান্টি পার্টিশন ডে'র শোভাযাত্রার ছবি তুলেছিলেন। এই শোভাযাত্রার সম্মুখে চলেছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। এই শোভাযাত্রার ছবি ধর্মতলায় কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে দেখানো হতো। জ্যোতিষবাবু ম্যাডান কোম্পানিতে চাকরি করতেন। পরে ম্যাডান কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে এক বাঙালির কোম্পানিতে যোগদান করেছিলেন।

একটা প্রশ্ন আমার মনে স্বতঃই উদয় হয়। প্রশ্নটা এই যে, বাংলা দেশের লোকের মধ্যে যখন সিনেমাবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল, তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা কী করছিল? এই সম্পর্কে বিশেষ করে আগে বোম্বাই প্রদেশের কথা মনে পড়ে। বোম্বাই শহর, কোলহাপুর, পুণা প্রভৃতি বোম্বাই প্রদেশের

অন্যান্য জায়গা বহুদিন থেকেই ভারতে সিনেমাশিল্পটির একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে আছে। বোম্বাইয়ের লোকেরা বাংলা দেশের লোকেদের চেয়েও ধনী, তাদের ব্যবসায়বুদ্ধি বেশি এবং কাজ করবার ক্ষমতাও অধিক। তারা কি এই সময়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল? কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-সময়কার বোম্বাইয়ের কোনো খবরই আমরা চেষ্টা করেও জানতে পারি না।

এ-সম্পর্কে যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বোম্বাইয়ের একটি ভদ্রলোক চলচ্চিত্র তৈরি করবার বাসনায় একটি ক্যামেরা কিনেছিলেন। কিন্তু মূলধনের অভাবেই হোক, অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক কোনো চলচ্চিত্র তৈরি করা সে-ভদ্রলোকের দ্বারা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি স্থানীয় তিন জন আর্টিস্টকে বাধ্য হয়ে ক্যামেরাটি বিক্রি করে দিলেন। এই আর্টিস্টদের নাম হচ্ছে এ. পি. কারন্ডিকার, এস. এন. পাটনকার এবং ভি. পি. দিবেকার। মূল্য হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন মাত্র আট শত মুদ্রা। ক্যামেরাটি তখনকার দিনের পক্ষেও অতি পুরাতন মডেলের ছিল এবং দুশো ফিটের বেশি ফিল্ম তাতে ভরবার উপায় ছিল না। এই ক্যামেরা নিয়ে তিন বন্ধু মিলে চলচ্চিত্র তৈরি করার কাজে লেগে গেলেন এবং অনেক উত্থান ও পতনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা 'সাবিত্রী' নামে একটি চিত্র তৈরি করলেন। ছবিখানি হয়েছিল অতি রাবিশ এবং ব্যাবসার দিক দিয়েও তাঁরা লোকসান খেয়েছিলেন। ভবিষ্যতে পাটনকার ফ্রেন্ডস এন্ড কোম্পানি নাম দিয়ে একটি কোম্পানি অনেকগুলি ছবি তৈরি

করেছিল। তাদের সঙ্গে এই বন্ধুত্রয়ের কোনো যোগ ছিল কি না বলতে পারি না।

ডি. জি. ফড়কে

ভারতীয় চিত্রশিল্পের সত্যিকারের ভিত্তিস্থাপন এবং এটিকে ব্যাবসার দিক দিয়েও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ যিনি প্রথম করেছিলেন তাঁর নাম হচ্ছে, দাদাসাহেব ফড়কে। যে প্রতিকূল আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে তাঁকে প্রথমে এই কার্যে অগ্রসর হতে হয়েছিল তার ইতিহাস অতি বিচিত্র। ফড়কের বাড়ি বোম্বাই প্রদেশের নাসিক শহরে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে দাদাসাহেব ফড়কে ফোটো-এনগ্রেভিং এবং ফোটো-লিথোগ্রাফির কাজে যোগদান করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই কার্যে দাদাসাহেবের অবসাদ এসে গেল এবং একটা নতুন কিছু করবার জন্য ভেতর থেকে তাগিদ আসতে লাগল। কী যে করবেন তা কিছু ঠিক নেই, অথচ বর্তমানে যে-কাজ করছেন সে-ও আর ভালো লাগছে না। মনের যখন এইরকম উদ্ভ্রান্ত অবস্থা সেই সময় একদিন বোম্বাই শহরের চৌপাটিতে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন এক জায়গায় বায়োস্কোপ দেখানো হচ্ছে। তিনি অন্যমনস্কভাবে একখানি টিকিট কিনে ভেতরে গিয়ে বসলেন। সেইখানে ছবি দেখতে দেখতে তাঁর মানসপটে আরেকখানি ছবি ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে লাগল, সেইসঙ্গে চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ গড়া হতে লাগল।

এই প্রদর্শনীতে যে-ছবি দেখানো হচ্ছিল তার নাম হচ্ছে 'Life of Jesus Christ'। যিশু খ্রিস্টের জীবনকাহিনি এবং তাঁর

অলৌকিক ক্রিয়া সকল দেখতে দেখতে তাঁর মনে হতে লাগল যদি শ্রীকৃষ্ণের জীবন এবং তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারা যায় তাহলে ভারতীয় চিত্রজগতে একটি অভিনব ব্যাপার হবে।

দাদাসাহেব নিজে চিত্র নির্মাণের কিছুই জানতেন না। শুধু দাদাসাহেব কেন, এ-সম্বন্ধে সে-সময়ে ভারতবর্ষের কেউই কিছু জানত না। কী করে একটির পর একটি দৃশ্যপট গ্রথিত করে ঘটনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা যেতে পারে তা শেখবার জন্য তিনি দৈনিক কয়েক বার করে এই প্রদর্শনী দেখতে আরম্ভ করে দিলেন। শেষকালে এই চিত্র নির্মাণের নেশা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে, আত্মীয়স্বজন সকলের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি তাঁর বর্তমান কাজ ত্যাগ করলেন এবং যা-কিছু অর্থ তিনি জমিয়েছিলেন তা নিয়ে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে আবার ইউরোপ যাত্রা করলেন।

দু-মাস বাদে দাদাসাহেব একটি উইলিয়ামসন ক্যামেরা, একটি পারফোরেটর এবং একটি প্রিন্টিং মেশিন নিয়ে ভারতে ফিরে এলেন। অনেকে হয়তো জানেন না আজকাল কাঁচা ফিল্মের দু-পাশে যেরকম ছ্যাঁদা থাকে তখন তা থাকত না। Sprocket perforation নিজেদেরই করে নিতে হতো।

এই প্রথম পরীক্ষার যুগে দাদাসাহেবের একমাত্র সহকারিণী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি একাধারে যেমন তাঁর কার্যের সহায়তা করতেন, অন্যদিকে নিরাশার অন্ধকারে আশার জ্যোতি তিনিই ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর এই ছবি নির্মাণের প্রচেষ্টাকে লোকে

পাগলামি বলে উড়িয়ে দিত। যখন অনেক চেষ্টা করেও কোনো ধনী শিল্পপতির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করতে পারলেন না, তখন দাদাসাহেবের স্ত্রী তাঁর সমস্ত গয়না বাঁধা দিয়ে এবং বিক্রি করে কিছু অর্থের সংস্থান করে দিলেন। এই অর্থ নিয়ে ইনি কতকগুলি সাময়িক টপিকাল ছবি তুলে ধনীদের দেখিয়ে দিলেন যে, ভারতবর্ষে চিত্র নির্মাণ হতে পারে।

এই ছবি দেখে অনেকগুলি মহাজন তাঁকে টাকা দিতে প্রস্তুত হলো। এদের কাছে থেকে টাকা নিয়ে তিনি ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র 'হরিশ্চন্দ্র' নির্মাণ করলেন। এই ছবিখানি ৩৭০০ ফিট লম্বা ছিল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বোম্বাই শহরে করোনেশন সিনেমায় 'হরিশ্চন্দ্র' প্রথম দেখানো হয়।

দাদাসাহেবের নামে ও-দেশে অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায়, তিনি ছবি তোলবার জন্য একবার বোম্বাইয়ের কোনো স্টুডিয়োওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন। স্টুডিয়োওয়ালাদের তৈরি সিন-সিনারি তাঁর পছন্দ না হওয়ায় তাঁরা দাদাসাহেবকে অন্য কোনোরকম বন্দোবস্ত করতে বলে। দাদাসাহেবের প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত জেদি। তিনি স্টুডিয়োওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করে ছবি নির্মাণ কার্য তখনকার মতো বন্ধ রেখে সোজা ফিরে এলেন নাসিকে এবং সমস্ত সিন-সিনারি ও সেটিং তাঁর নিজের মনের মতো করে তৈরি করে আবার চললেন বোম্বাইয়ের দিকে। বলা বাহুল্য, দাদাসাহেব নিজেও চললেন গোরুর গাড়ির পাশে পাশে। তখন বর্ষাকাল, বোম্বাই প্রদেশে যে কীরকম বর্ষণ হয় তা ওদিকে যাঁরা বাস করেছেন তাঁরা ছাড়া

অন্য লোকে কল্পনাও করতে পারেন না। পথে চলতে চলতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে সিন-সিনারির রং ও চিত্র ধুয়ে-মুছে একেবারে সাফ হয়ে গেল। দাদাসাহেব আবার ফিরলেন নাসিকে এবং সেখানে গিয়ে আবার নতুন করে সিন-সিনারি তৈরি করে আবার চললেন বোম্বাইয়ের দিকে।

পরিচালক হিসেবে দাদাসাহেব খুব একটা কৃতিত্ব কোথাও দেখাতে পারেননি। চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা সম্বন্ধেও তিনি খুব একটা নতুনত্ব কোথাও দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সেই পুরাতন পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বন করে তিনি ছবি তুলেছেন। যদিও তাঁর পরে অন্যান্য কোম্পানিরা সেই পৌরাণিক পন্থাই অবলম্বন করে অনেক কাল চলেছিলেন। দাদাসাহেবের কৃতিত্ব এবং বিশেষ কৃতিত্ব ট্রিক-ফোটোগ্রাফিতে।

দাদাসাহেব পরিচালিত শেষ চলচ্চিত্র 'গঙ্গাবতরণে'ও ট্রিক-ফোটোগ্রাফির অন্ত নেই। এই ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা আমার কথার প্রমাণ পাবেন। কিন্তু যাই হোক, সিনেমাশিল্পকে ব্যাবসার ভিত্তিতে দাঁড় করালেও তিনি নিজে ব্যবসায়ী লোক তো ছিলেনই না, পরন্তু তাঁকে অব্যবসায়ী বলা যেতে পারত। দাদাসাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এবং প্রায় এক বৎসর কাল আমরা একই জায়গায় কাজ করেছিলুম। ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষি আমি কোলহাপুরে যাই, কোলহাপুর রাজ্য হিসেবে এবং শহর হিসেবে ছোটো হলেও এইটুকু জায়গায় অনেকগুলি প্রতিভাবান শিল্পী বাস করতেন। বিখ্যাত আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের শিষ্য শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল সরনায়েক, প্রাতঃস্মরণীয় ভাস্কর বাগলার শিষ্য গোবিন্দ

রাও তাম্বে, বরোদার লক্ষ্মীবাই প্রভৃতির জন্মভূমি কোলহাপুর। এঁরা ছাড়া আরও অসংখ্য গাইয়ে ও বাজিয়ে তখন কোলহাপুরে বাস করতেন। বিখ্যাত আবদুল করিম খাঁ সাহেব তখন জীবিত ছিলেন এবং প্রায়ই কোলহাপুরে আসতেন গান-বাজনার জলসায়। তিনি বাস করতেন কোলহাপুরের অন্তর্গত মিরাজ নামে একটি ছোট্ট দেশীয় রাজ্যে। প্রসঙ্গক্রমে এ-কথাও বলে রাখা ভালো যে, এই মিরাজে তখনকার দিনে সব থেকে ভালো তাম্বুরা সেতার ও সুরবাহার তৈরি হতো। মিরাজের লাউ এইসব যন্ত্র তৈরি করবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং এখান থেকেই ভারতের চতুর্দিকে এই লাউ চালান হয়ে থাকে। সকলেই জানেন যে, ভারতের অন্যতম বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রভাত সিনেমা কোম্পানির জন্ম হয় কোলহাপুরে। কোলহাপুরেরই কয়েক জন আর্টিস্ট মিলে প্রভাত কোম্পানি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে শান্তারাম, বাবুরাও পেন্ডারকার, বাহালবা পেন্ডারকার, বিনায়ক কর্ণাটকি, ধাইবার, ফতেলাল প্রভৃতির নাম ভারতবর্ষে সর্বজনবিদিত।

কোলহাপুর রাজ্য প্রভাত সিনেমা কোম্পানির ওপর বিশেষ একটা কর ধার্য করায় প্রভাত কোম্পানি কোলহাপুর ছেড়ে পুণায় এসে নতুন স্টুডিয়ো তৈরি করেন।

প্রভাত কোম্পানি কোলহাপুর ত্যাগ করবার আগে তাঁদের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায় একদল কোলহাপুরেই থেকে গেলেন এবং শান্তারাম, ধাইবার, ফতেলাল ইত্যাদি পুণায় চলে গেলেন। কোলহাপুরে যাঁরা রইলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন বাহালবা পেন্ডারকার, বাবুরাও পেন্ডারকার ও বিনায়ক কর্ণাটকি।

কোলহাপুরের মহারাজা বাহালবা পেন্ডারকারকে ভার দিয়ে একটি স্টুডিয়ো খোলান। এই স্টুডিয়োর নাম 'কোলহাপুর সিনেটোন'। বাহালবা পেন্ডারকার একজন সাহিত্যিক এবং অত্যন্ত তেজস্বী ও জেদি লোক। ইনি মহাত্মা গান্ধীর অত্যন্ত ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। এমন লোকের সঙ্গে রাজারাজড়া তো দূরের কথা, তখনকার দিনের সিনেমামালিকদের বনিবনা হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে কিছুদিন যেতে-না-যেতেই তাঁকে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিতে হল।

আমি যখন কোলহাপুর সিনেটোনে কাজ নিয়ে যাই, তখন ওখানকার ম্যানেজার ছিলেন বাবুরাও পেন্ডারকার। বাবুরাও পেন্ডারকারের নাম সিনেমাজগতে অপরিচিত নয়। তাঁর মতো চরিত্র-অভিনেতা ভারতীয় সিনেমাজগতে খুব কম আছে বললেই চলে। কয়েক বছর থেকেই তাঁকে আর কোনো চিত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে চিত্রজগৎ থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন। এই বাবুরাও পেন্ডারকারই আমাকে বোম্বাই থেকে কোলহাপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমি যখন কোলহাপুরে যাই, তখন সেখানে ছিল দুটো স্টুডিয়ো। দুটোই খুব বড়ো স্টুডিয়ো। জিনিসপত্র কিছুরই অভাব নেই বললেই চলে। একটি হচ্ছে মহারাজার নিজস্ব, অপরটির নাম শালিনী সিনেটোন। এর মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত আক্কা সাহেব মহারাজ, ইনি কোলহাপুর মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভগিনী এবং দেওয়ান-এর (বড়ো) মহারানি। আক্কা সাহেব তাঁর পৌত্রীর নাম দিয়ে এই স্টুডিয়ো করেছিলেন।

২১

কোলহাপুরে গিয়ে আমি শুনলুম যে, শালিনী স্টুডিয়োতে শ্রীযুক্ত বাবুরাও পেন্টার একখানা ছবি তুলছেন। বাবুরাও পেন্টারের নাম এ-দেশের অনেকে হয়তো জানেন না, কিন্তু ও-প্রদেশে লোকে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তিনি ছিলেন একাধারে ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। তাঁর পিতাও ছিলেন ভাস্কর। পুণাতে রাস্তার ওপরে যে অশ্বারোহী শিবাজির মূর্তি আছে তার পরিকল্পনা করেছিলেন এই বাবুরাও পেন্টার। শান্তারাম প্রভৃতি প্রভাত কোম্পানির প্রায় সমস্ত মহারথীরাই তাঁর শিষ্য বলে শুনেছি।

বাবুরাও পেন্টারের সঙ্গে দেখা হল। তখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। দেখলে মনে হয় ষাট অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। যদিও বয়স তিনি বললেন চল্লিশ ও পঞ্চাশের মাঝামাঝি কি একটা সংখ্যা আমার ঠিক মনে নেই। লম্বা দাড়ি, স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গিয়েছে। তাঁর মুখ-চোখে প্রতিভার কোনো লক্ষণ আমি দেখতে পাইনি। প্লেগ হয়ে জিভটা অসাড় হয়ে গিয়েছে। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না। মারাঠিরা, শুধু মারাঠি কেন, বোম্বাইয়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই মারাঠি, গুজরাতি, পারসি এমন কি সেখানকার বোরি ও খোজা সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা যে একরকম অদ্ভুত হিন্দি, উর্দু বলে (অন্তত সে-সময় বলত) যা তারা ছাড়া অন্য লোকের বোঝা খুবই মুশকিল। ছেলেবেলা থেকে ওদের সঙ্গে মিশে মিশে ওদের এই ভাষা আমার রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বাবুরাও এই অদ্ভুত হিন্দি কিছু কিছু বলতে পারতেন। তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে করতে কতক স্পষ্ট ও কতক অস্পষ্ট শব্দে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের স্টুডিয়োতে

দাদাসাহেব ফড়কে কাজ করেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে কি?'

আমি তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম। দাদাসাহেবের নাম আমি অনেক আগেই শুনেছিলুম। আমরা একই স্টুডিয়োতে কাজ করি, অথচ এক মাসের মধ্যে তাঁকে দেখতে পর্যন্ত পেলুম না। এই প্রসঙ্গে বাবুরাও পেন্টারের কাজ করবার পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বললে পাঠকবর্গ চমৎকৃত হবেন।

একদিন রাত্রে শ্রীযুক্ত আক্কা সাহেব মহারাজ আমাকে তাঁর নিজের প্যালেসে ডেকে বললেন— দেখো, আমাদের জন্যে শালিনী স্টুডিয়োতে একটা ছবি করে দিতে পার?

আমি বললুম— মহারাজ, আপনার হুকুম অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই, কিন্তু আপনি জানেন আমি মহারাজার স্টুডিয়োতে ছবি করব বলে এসেছি।

আক্কা সাহেব বললেন— সে আমি মহারাজকে বলে তাঁর মত নিয়ে নেব।

আমি বললুম— আরেকটি বাধাও আছে, যদিও সেটা নগণ্য, তবু আপনাকে বলে রাখি। বাবুরাও পেন্টার মশাই আপনাদের ওখানে কাজ করছেন, আমি সেখানে গেলে তিনি দুঃখিত হতে পারেন।

আক্কা সাহেব আমাকে থামিয়ে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন— আমচি দাড়ি, অর্থাৎ আমাদের দাড়ি! দাড়ির কথা আর বোলো না। প্রায় দু-বছর হল সে ছবি তৈরি করতে আরম্ভ করেছে, এখনও তার দশ ভাগের এক ভাগও হয়নি। সে বড়ো বড়ো স্টুডিয়ো-জোড়া সেট তৈরি করায়, তাতে থামই থাকে

পঁচিশ-তিরিশটা, প্রত্যেক থামে ছোটো বড়ো নানানরকম প্রতিমূর্তি লাগানো হয়। Papier-mache দিয়ে সেইসব মূর্তি তৈরি করানো হয়। তারপর একবার ক্যামেরা দিয়ে ঘুরে সেই সেটিঙের মূর্তিগুলো কেমন উঠল তা পরীক্ষা করা হয়।

বোম্বাইয়ে যখন প্রথম যাই, তখন সেখানকার স্টুডিয়ো-মালিকদের বলেছিলাম, আসল শুটিং করবার আগে আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে দিন কয়েক এক রিহার্সাল করতে চাই। আমার কথা শুনে তারা হেসে উঠেছিল। বলেছিল, বাংলা দেশের ওসব চাল বোম্বাইয়ে চলবে না। কিন্তু কোলহাপুরে এসে দেখলুম যে, এখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীর রিহার্সাল তো পরের কথা, সেটিঙে ক্যামেরা marshalling করতেই দু-দিন সময় কাটে।

যাই হোক, আক্কা সাহেব বললেন— এসব ছাড়াও বাবুরাও পেন্টার নিরর্থক অনেক সময় ব্যয় করেন। তখনকার মতো তাঁদের হয়ে একখানা ছবি করতে রাজি হয়ে আমি বিদায় নিলুম।

কোলহাপুর সিনেটোনে ফড়কে মহাশয়ের অনুসন্ধান করে জানলুম যে, তিনি স্টুডিয়োতে খুব কমই আসেন এবং বর্তমানে নাসিকে গিয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার ফিরবেন। পেন্ডারকারের কাছে এও জানতে পারা গেল যে, দাদাসাহেব আজ দু-বছর এখানে কাজ করছেন, এখনও ছবির কিছুই হয়নি। ট্রিক-ফোটোগ্রাফির পরিকল্পনা ও উপায় উদ্ভাবন করতে করতেই তাঁর দিন কেটে যায়, কাজ করবার আর সময় পান না। এ-কথাও জানতে পারা গেল যে, স্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষেরা অর্থাৎ মহারাজ নিজে ও প্যালেসের কর্মচারীরা দাদাসাহেবের ওপর বিশেষ প্রসন্ন নন।

কিছুদিন পরে দাদাসাহেব কোলহাপুরে ফিরলে পর একদিন স্টুডিয়োতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলুম তিনি শুয়ে আছেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাঁকে ঘিরে বসে আছে, একজন মাথায় বাতাস করছে। বেঁটেসেঁটে লোকটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, দাড়িগোঁফ চাঁচা, বয়স বোধ হয় যাট পেরিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে আলাপ হল, বললেন— ব্লাড-প্রেসারের রোগে ভুগছি, কোনো কাজই করতে পারিনে। দিনরাত শুয়েই কাটাতে হয়। এখানে কাজ নিতে আমি চাইনি, তবে এরা জোর করাতে বাধ্য হয়ে আমায় কাজ নিতে হয়েছে। তার ফলে হয়েছে উলটো বিপত্তি।

আমি বললুম— কেন বিপত্তি কেন? এখনও তো আপনার শরীর বেশ ভালোই আছে।

তিনি বললেন— ভালো তো আছে, কিন্তু এদের তাড়ার চোটে শরীর আমার খারাপ হয়ে গেল। আমি এদের প্রথমেই বলে দিয়েছিলুম, দেখো বাপু, আমাকে দিয়ে যদি কাজ করাতে চাও তবে ছবি তৈরি করতে একটু দেরি হবে। আমি ভেবে ভেবে ট্রিকস উদ্ভাবন করব, তাকে কার্যে পরিণত করতে অনেক নতুন জিনিস তৈরি করাতে হবে যা তোমাদের স্টুডিয়োতে নেই। এইসব ব্যাপারে দেরি হবে। তখন এরা শুনলে না। এখন এদের তাড়ার চোটে আমার ব্লাড-প্রেসার দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। হাজার টাকা মাইনে দিয়ে আমার মাথা কিনে রেখেছে আর কী! আজ সকালে মহারাজা সাহেব আমাকে প্যালেসে ডেকে নিয়ে গিয়ে যাচ্ছেতাই করে বললেন, ব্রাহ্মণের মর্যাদাটুকু পর্যন্ত রাখলেন না।

এ-ক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে, সে-সময় কোলহাপুর রাজ্যে ব্রাহ্মণবিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল। কোলহাপুরের মহারাজার পরিবার বলেন যে, তাঁরা শিবাজি মহারাজার বংশধর। মহারাজা শিবাজি ব্রাহ্মণদের ঘুস দিয়ে যে নিজে ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হয়েছিলেন সে-কথা এঁরা এখন সাফ ভুলে গিয়েছেন। কয়েকটি ব্রাহ্মণেতর জাতি মিলে মারাঠা জাতি তৈরি হয়েছে এবং কোলহাপুরের বিখ্যাত অম্বাদেবীর প্রধান পুরোহিত হলেন এইরকম একজন মারাঠা ও মহারাজার প্রিয়পাত্র।

দাদাসাহেবের সঙ্গে আমার ভাব জমতে লাগল। স্টুডিয়োতে আসেন যান, কোনোদিন রিহার্সাল দেন, কোনোদিন-বা শুয়ে থাকেন, ন-মাসে ছ-মাসে হয়তো-বা একদিন শুটিং করেন। মহারাজা প্যালেসে ডেকে নিয়ে বেশ করে যে-দিন ধমক দেন, দাদাসাহেবের ব্লাড-প্রেসার যায় বেড়ে যায়, পনেরো দিন আর উঠতে পারেন না। একদিন তিনি আমাকে বললেন— এত জায়গা থাকতে তুমি এখানে চাকরি নিলে কেন বলো দিকিনি। এরা অতি সাংঘাতিক লোক। পান থেকে চুন খসলে এরা মজা দেখিয়ে দেবে। দেশি রাজ্যের রাজারাজড়াদের কাণ্ডকারখানা তুমি জান না।

আমি বললুম— দেশীয় রাজ্যের রাজারাজড়াদের আমি খুবই চিনি। তবে, দাদাসাহেব আপনাকে বলে রাখি আমিও অতি সাংঘাতিক লোক। ওদের আমি গ্রাহ্য করি না। আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা।

দাদাসাহেব বললেন— আরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা তো কী হয়েছে? ধরো, তুমি এদের কবল থেকে পালিয়ে বোম্বাইয়ে

চলে গেলে। এরা তোমার নামে ওয়ারেন্ট বার করে বোম্বাইয়ে পাঠিয়ে দিলে। একজন লোক খাড়া করলে, যে বলবে, তুমি তার বাড়ির গয়না চুরি করে পালিয়েছ। ব্রিটিশের সঙ্গে শর্ত অনুসারে তারা তোমায় গ্রেপ্তার করে এদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য। এরা তোমাকে নিয়ে এসে জেলখানায় পুরে দেবে, শুধু তা-ই নয়, তিন বছর ধরে তোমাকে দিয়ে পাইখানা সাফ করাবে। তারপরে আদালতের বিচারে তুমি মুক্তিও পেতে পার, তোমার জেলও হতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কী, দাদাসাহেবের কথা শুনে আমার তো ভয়ই ধরে গিয়েছিল। অবিশ্যি অতখানি না হলেও কোলহাপুরের সঙ্গে আমার শেষকালে একটা হাঙ্গামা বেঁধেছিল। সে-কথা বলার প্রয়োজন এখানে নেই। আমি কোলহাপুরে প্রায় দশ মাস ছিলুম। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা আমাকে দিয়ে দুখানা ছবি করিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু দাদাসাহেবকে দিয়ে একখানা করানোও সম্ভব হয়নি। কোলহাপুর যখন ছেড়ে আসি, তখনও তিনি নূতন নূতন ট্রিক-ফোটোগ্রাফির পরিকল্পনা করছেন এবং কী করে সেগুলিকে কাজে পরিণত করবেন তারই উপায় উদ্ভাবন করতে ব্যস্ত আছেন।

বোম্বাই ফিরে এসে বছর খানেকের মধ্যেই শুনলাম দাদাসাহেব রঙিন চলচ্চিত্র তৈরি করবেন এবং তারই ক্যামেরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে তিনি বিলেত যাত্রা করছেন। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই শোনা গেল, দাদাসাহেবের অবস্থা খুব খারাপ। তার জন্য সেখানে একটা সাহায্যভাণ্ডার পর্যন্ত খোলা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে ইম্পিরিয়াল সিনেমা কোম্পানির মালিক শ্রীযুক্ত আর্দেসার ইরানির

তত্ত্বাবধানে এই সাহায্যভাণ্ডার খোলা হয়েছিল এবং তিনি নিজে হাজার টাকা দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, কোলহাপুরে তিন বছরে যে-কটি টাকা রোজগার করেছিলেন, বিলেতে গিয়ে ক্যামেরা ইত্যাদির পেছনে তা উড়িয়ে দিয়ে দাদাসাহেব দেশে ফিরেছিলেন। কারণ তিনি নিজে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন এবং তাঁর জীবনযাত্রার খরচও ছিল অল্প। এরই কিছুকাল বাদে শোনা গেল, দাদাসাহেব দেহরক্ষা করেছেন।

ফড়কে মহাশয়ের 'হরিশ্চন্দ্র' প্রকাশ হওয়ার পরে বোম্বাইয়ের আরও অনেকে ছবি করবার দিকে মন দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে পাটনকার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কোম্পানির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা ভক্ত দয়াল, ভক্ত প্রহ্লাদ, কচ ও দেবযানী প্রভৃতি কয়েকখানি ছবি তৈরি করেছিলেন।

জে. এফ. মদন

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম যুগে জে. এফ. মদন (ম্যাডান) নামে এক পারসি ভদ্রলোক কলকাতা শহরে মদ ও অন্যান্য Provisions-এর ব্যাবসা করতেন। ইনি মিলিটারি ও অন্যান্য জায়গায় মাল সরবরাহ করে প্রভূত পয়সা উপার্জন করতেন। মদন সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই সিনেমাশিল্প। তিনি প্রথমে পরীক্ষা হিসেবে ভারতবর্ষময় টুরিং কোম্পানি পাঠাতে আরম্ভ করলেন। কলকাতা শহরেও কখনও গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলে কখনও-বা ব্যান্ডম্যান কোম্পানির এম্পায়ার থিয়েটারে বর্তমানে কর্পূরচাঁদের যেখানে রক্সি থিয়েটার— ছবি দেখাতে আরম্ভ

করলেন। সে-সময়ে তাঁদের ব্যাবসা শুধু কলকাতা শহরে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এরপরেই মদন সাহেব কলকাতার প্রথম সিনেমা হাউস তৈরি করলেন, সেন্ট্রাল মিউনিসিপাল আপিস ও হগ সাহেবের বাজারের মধ্যবর্তী জমিতে। এই সিনেমা হাউসের নাম হল এলফিনস্টোন পির্কচার প্যালেস, যেটা এখন মিনার্ভা সিনেমা হাউস (বর্তমানে চ্যাপলিন) হয়েছে।

কয়েক বছরের মধ্যেই জে. এফ. ম্যাডান কোম্পানি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান শহরে নিজেদের সিনেমা হাউস তৈরি করে ফেললেন। এক সময় ম্যাডান কোম্পানি প্রায় একশো সিনেমা হাউসের মালিক ছিলেন। এ ছাড়াও তাঁরা অন্যের হাউসও ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীর আবহাওয়া একটু ঠান্ডা হলেই ম্যাডান কোম্পানি চলচ্চিত্র করবার দিকে মন দিলেন এবং তাঁদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে লিমিটেড করে নাম দিলেন ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড। ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রথম ছবির নাম 'বিল্বমঙ্গল'। এই ছবি ৮ নভেম্বর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরের কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে প্রথম দেখানো হয়। এই ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডই বাংলা দেশে প্রথম চলচ্চিত্র তৈরি করবার স্টুডিয়ো খোলে টালিগঞ্জে, এখন সে-স্টুডিয়োর নাম হয়েছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়ো। জে. এফ. মদনই প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের প্রথম এগজিবিটর, প্রথম প্রোডিউসার মদন সাহেবের মৃত্যুদিন অবধি এ-দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠানই প্রমুখ প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হতো।

মদন সাহেব নিজে অতি সৎ লোক ছিলেন এবং দেশের প্রায় প্রত্যেক সৎকার্যেই তিনি দান করতেন। অত বড়ো কোম্পানির মালিক এবং প্রভূত ধনের অধীশ্বর হয়েও তিনি ছিলেন নিরভিমানী। ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারত। এমনকী স্কুলের ছেলেরাও সদলবলে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে মোটা রকমের চাঁদা নিয়ে যেত। এ-কথা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। মদন সাহেবের মৃত্যুর সময় তাঁর বিরাট ব্যবসায়ের উপযুক্ত কর্ণধার রেখে গিয়েছিলেন। এঁর নাম হচ্ছে রুস্তমজি ধোতিওয়ালা। রুস্তমজির কথা কলকাতায় তো বটেই, এমনকী ভারতবর্ষময় প্রবাদের মতো বিদিত আছে। তাঁর আমলে ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। শোনা যায়, রুস্তমজি নাকি মদন সাহেবের করিন্থিয়ান থিয়েটারে চাকরি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। পরে তাঁর কর্মদক্ষতা ও তৎপরতা দেখে মদন সাহেব তাঁকে অন্য ব্যবসায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নেন। রুস্তমজি পরে জে. এফ. ম্যাডানের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড যত ছবি তৈরি করেছিলেন, তার যতদূর হিসাব আমরা জানতে পেরেছি, একটা হিসাব এখানে দেবার চেষ্টা করছি।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে তাঁরা 'বিল্বমঙ্গল' ছবি তৈরি করেন, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঠিক এক বছর পরে তাঁরা 'মহাভারত' তৈরি করেন। এই 'মহাভারত' এককালে পারসি থিয়েটারে খুব জমেছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা 'শিবরাত্রি', 'ধ্রুবচরিত্র', 'বেহুলা', 'মা দুর্গা', 'নলদময়ন্তী' ও 'বিষ্ণু অবতার'— এই ছ-খানি ছবি

তৈরি করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'রত্নাবলী', 'বিষবৃক্ষ', 'প্রিন্সেস বুদৌর', 'রাজা পরীক্ষিৎ', 'সতী বা দক্ষযজ্ঞ', 'ভীষ্ম', 'মোহিনী', 'পতিভক্তি', 'তারা দি ড্যান্সার', 'লায়লা মজনু', 'রাজা ভোজ', 'ম্যারেজ মার্কেট', 'রামায়ণ' ও 'ভগীরথ-গঙ্গা'— এই চোদ্দোখানি ছবি তৈরি করেন। ম্যারেজ মার্কেটের নায়ক ছিলেন বিখ্যাত হাস্যাভিনেতা পরলোকগত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা তিনখানি মাত্র ছবি তৈরি করেন— 'মাতৃস্নেহ', 'নূরজাহান' ও 'কমলেকামিনী'। ১৯২৪ সালে 'বসন্তপ্রভা', 'পত্নীপ্রতাপ' ও 'গোমাতা' তৈরি করেন। ম্যাডান কোম্পানির নিজের থিয়েটার ছিল। তাঁরা অধিকাংশ ছবি সেই থিয়েটারের অভিনেতাদের দিয়েই করাতেন। সে-সময় ফিরিঙ্গি মেয়েদের দিয়ে স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করানো হতো। অন্তত ম্যাডান থিয়েটার করাতেন। এখনকার তুলনায় সেসব ছবি উল্লেখযোগ্য নয় তো বটেই, সে-সময় বোম্বাই প্রদেশে যেসব ছবি তৈরি হতো, তাদের সঙ্গে তুলনায় এগুলি দাঁড়াতে পারত না। যদিও ম্যাডান কোম্পানির ছবি ব্যাবসা হিসেবে পয়সা বেশি আনত, তার কারণ ম্যাডানের ভারতবর্ষময় শো-হাউস ছিল এবং প্রত্যেক শো-হাউসে এক সপ্তাহ করেও যদি একখানা ছবি ঘুরিয়ে আনা হতো, তাহলেও প্রায় আড়াই বছর সময় লাগত এবং ছবি তৈরির খরচের অনেক গুন উঠে আসত। এদিক দিয়ে কোম্পানির লোকসান কিছুই ছিল না, বরং তাঁরা দিনে দিনে লাভবানই হয়ে উঠছিলেন।

ম্যাডান কোম্পানির ছবির প্রসঙ্গে আজ একটা হাসির কথা মনে পড়ছে। প্রায় প্রত্যেক ছবিতেই তাঁরা কতগুলো সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের দৃশ্য জুড়ে দিতেন। বলা বাহুল্য, সে-দৃশ্যগুলি খুবই

সুন্দর এবং বিদেশি ছবি থেকে কেটে নেওয়া। মনে করুন, আপনি ধ্রুবচরিত্র দেখছেন— অদ্ভুত ধ্রুব, অদ্ভুত এক জঙ্গলে বসে অদ্ভুত তপস্যা করছে। হঠাৎ তার মধ্যিখানে একটা চমৎকার সূর্যাস্তের দৃশ্য এসে পড়ল। দর্শকবৃন্দ হইহই করে উঠল। উল্লাসধ্বনি, শিস ও হাততালির আওয়াজে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে উঠল। ম্যাডানের অনেক ছবিই পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, যিনি পরে ম্যাডান কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে কালী ফিল্মস স্টুডিয়ো করেছিলেন।

মদন সাহেবের এক ছেলে ফ্রামজি মদন ইউরোপ এবং আমেরিকার হলিউড প্রভৃতি স্থানে ঘুরে এসে প্রিন্সেস বুদৌর ছবি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে হলিউড কিংবা জার্মানির কোনো চিহ্নই ছিল না। আসলে কিন্তু সেটি 'মদন মার্কা' ছবিই তৈরি হয়েছিল।

ম্যাডান কোম্পানির হাতে ছবি নির্মাণের উপযোগী মালমশলা যত ছিল তা ভারতবর্ষের আর কোনো কোম্পানির ছিল না। তাঁরা উত্তর কলকাতায় বাঙালি থিয়েটার খুলেছিলেন। শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ অনেক প্রতিভাবান শিল্পী তাঁদের থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। শিশিরকুমার একখানি কি দুখানি চিত্রে কাজও করেছিলেন, কিন্তু ছবির উৎকর্ষতা তাতে কিছুই বাড়েনি। অর্থ দিয়ে যা পাওয়া যায়, তা ম্যাডান কোম্পানির সবই ছিল, ছিল না কেবল অর্থব্যয় করলেও যা পাওয়া যায় না। যে সূক্ষ্ম কলাজ্ঞান থাকলে ছবিকে এবং গল্পকে রসোত্তীর্ণ করতে পারা যায় সে-জ্ঞান ম্যাডান কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কারও ছিল

না। তাঁদের আত্মজ্ঞান এবং আত্মম্ভরিতা ছিল হিমালয়সদৃশ উচ্চ, কাজেই অন্য কারও কাছ থেকে কোনো মতলব নেওয়া তাঁরা একরকম হেয় করতেন। নইলে আগা হিসসার কাশ্মীরি, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি নাট্যকার ও গল্পলেখক এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ তরুণ অভিনেতাদের দল তাঁদের হাতে থাকতে তাঁরা একখানাও উল্লেখযোগ্য ছবি নির্মাণ করতে পারেননি! শিশিরকুমারের মতো প্রতিভাবান অভিনেতাকে ম্যাডান কোম্পানি 'একাদশী' ও 'কমলেকামিনী' নামে দুই ছবিতে নামিয়েছিলেন। ছবির গল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তাঁরা কোনোরকম মৌলিকতা দেখাতে পারেননি। বিশেষ করে নির্বাক ছবির যুগে। সে-সময় তাঁরা রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক গল্পেরই ছবি তৈরি করেছিলেন, কারণ গল্পের ক্ষেত্র ভারতবর্ষে সবসময়েই আপনিই তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁরা ছবি তৈরি করতেন তাঁরা অনেকেই হিন্দুদের পুরাণ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। মনে পড়ে তাঁদের কোনো একটা পৌরাণিক ছবিতে একজন অভিনেতা স্লিপিং সুট পরে মহাদেবের ভূমিকায় অভিনয় করে গেলেন। এই অভিনেতার নাম ম্যানেলি।

ম্যাডান কোম্পানি সিনেমা বিষয়ক অন্যান্য ব্যাবসাও করতেন— যেমন ক্যামেরা, ফিল্ম ইত্যাদি। তাঁরা ভারতবর্ষের এদিককার 'ডরবেল' ক্যামেরা কোম্পানির একমাত্র এজেন্ট ছিলেন। আমাদের মনে পড়ে, আমরাই এঁদের কাছ থেকে দু-তিনটে ক্যামেরা খরিদ করেছি। তাঁরা খুব সমারোহে সবাক চিত্র নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই তাঁদের কর্ণধার

রুস্তমজির মৃত্যু হওয়ায় দেখতে দেখতে কোম্পানি চৌপাট হয়ে গেল।

ম্যাডান কোম্পানির যখন খুব জমজমাট অবস্থা তখন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাঙালি ফিল্ম কোম্পানির সূচনা হয়। এই কোম্পানির নাম ছিল ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি, এর কর্ণধার ছিলেন শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র লাহিড়ী। তিনি এখন কলকাতায় কলম্বিয়া ফিল্ম কোম্পানির ম্যানেজার। লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষিত, নম্র, স্বল্পভাষী এবং কর্মঠ ছিলেন, তাঁর চালনায় আশা করা গিয়েছিল বাংলায় ফিল্মশিল্প অনেক উন্নতি করবে। তাঁদের প্রথম ছবি 'England Returned'। এই ছবি পরিচালনা করেছিলেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্যামেরার কাজ করেছিলেন পরলোকগত জ্যোতিষচন্দ্র সরকার। ধীরেনবাবু সিনেমাক্ষেত্রে এখনও জ্বলজ্বল করছেন, কিন্তু জ্যোতিষচন্দ্র আর ইহলোকে নাই। জ্যোতিষচন্দ্র ম্যাডান কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তখনকার যুগের পক্ষে বেশ মোটা মাইনেও পেতেন। বাঙালি কোম্পানি হবে এই আদর্শেই তিনি এসে ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ 'অনির্দিষ্ট অদৃষ্ট পারাবারে' জীবনতরী ভাসিয়েছিলেন। জ্যোতিষ সরকার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত দিক দিয়ে আরেকটু কিছু বলা প্রয়োজন বলে বোধ করি। বাঙালির সিনেমা কোম্পানি হবে এবং তা একদিন খুব বড়ো হয়ে উঠবে, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তিনি নির্দিষ্ট চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আমাদের আড্ডায় আসতেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব জমে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন দিলখোলা

লোক, কাল কী হবে তা ভাবতেন না। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখতেন বলে আমরা তাকে চাচা বলে ডাকতুম। ভালোবাসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'চাচা' 'চাচুতে' পরিণত হয়ে গেল। একদিন শুনলুম আমাদের চাচা রোগশয্যা গ্রহণ করেছেন। তারপরে দীর্ঘকাল অতি যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগ করার পর তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

'England Returned' ছবিখানি ১৯২১ সালের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ভবানীপুরের রসা থিয়েটারে প্রথম দেখানো হয়। অনেকে হয়তো জানেন না, তখনকার দিনে বাঙালি কোম্পানির ছবি দেখাবার প্রেক্ষাগৃহ এ-পাড়ায় পাওয়া মুশকিল হতো। এই রসা থিয়েটারই বর্তমানে পূর্ণ থিয়েটার। 'England Returned'-এর পর নীতিশ লাহিড়ী মশায়ের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। পরে তাঁরা 'যশোদানন্দন' ও 'সাধু বা শয়তান' নামে আরও দুখানি ছবি নির্মাণ করেছিলেন।

'England Returned' ছবির কাজ আরম্ভ হবার বহু পূর্বেই অরোরা সিনেমা কোম্পানি 'রত্নাকর' ও 'দব্বুর কেলেঙ্কারী' এই দুখানি ছবির নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। অরোরা সিনেমার মালিক ছিলেন পরলোকগত অনাদি বসু মহাশয়। অনাদি বসু বাংলা দেশে সিনেমাক্ষেত্রে সকলেরই পরিচিত। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু, অমায়িক এবং পাকা ব্যাবসাদার। সিনেমাজগতে যেখানে পথ চলতে ঝগড়া হয় সেখানে অজাতশত্রু হয়ে থাকা বড়ো কম গুণের কথা নয়। অনাদিবাবু বিন্দু বিন্দু করে তাঁর ব্যাবসাটিকে গড়ে তুলেছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। অরোরা সিনেমা কোম্পানির ভার পড়েছে তাঁর সুযোগ্য পুত্রদের ওপর।

বাংলা দেশে শুধু বাংলা দেশে কেন, আমার মনে হয় সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে অরোরা সিনেমা কোম্পানি সিনেমাব্যাবসার সব থেকে পুরাতন প্রতিষ্ঠান।

'রত্নাকর' এবং 'দব্বুর কেলেঙ্কারী' প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট। সে-সময়, তারপরে তাঁরা 'কৃষ্ণসখা সুদামা', 'দেবদূত' এবং আজও সবাক চিত্রের যুগে অনেক ছবি নির্মাণ করেছেন।

১৯২২ সালে ফোটোপ্লে সিন্ডিকেট অফ ইন্ডিয়া নামে আরও একটি বাঙালি ফিল্ম কোম্পানি গঠিত হয়। তাঁরা 'The Soul of a Slave' নামে একখানি ছবি নির্মাণ করেন। এই ছবির পরিচালনা করেন পরলোকগত প্রফুল্ল ঘোষ। তখনকার দিনে বাংলা দেশে যেসব ছবি তৈরি হচ্ছিল সেগুলির তুলনায় এ-ছবিখানি অনেক বিষয়ে উন্নত ছিল। ছবিখানির একটি বিশেষত্ব এই যে, বাংলা দেশের অন্যতম বিখ্যাত নট শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীকে এতে প্রথমে দেখা যায়।

প্রফুল্লবাবু এই ছবি তৈরি করে পরে বোম্বাইয়ে যান এবং সেখানে গিয়ে অনেকগুলি ছবি নির্মাণ করেছিলেন। বোম্বাইয়ে কৃষ্ণা সিনেমা কোম্পানিতে তাঁর তৈরি 'হাতেমতাই' ছবি সে-সময় খুব চলেছিল। সবাক যুগ আরম্ভ হবার কিছু পরে তিনি কলকাতায় ফিরে এসেও কয়েকখানি ছবি করেছিলেন। এর কিছুদিন পরেই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ম্যাডান থিয়েটার ১৯২১ সালে কর্নওয়ালিশ স্টেজে বাংলা থিয়েটার কোম্পানি খোলেন। প্রথমে তাঁরা অন্য অন্য থিয়েটার

কোম্পানির অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নিয়ে কোম্পানির কাজ আরম্ভ করেন। আগা হিসসার কাশ্মীরির 'অপরাধী কে' নামে একখানা ডিটেকটিভ নাটক এখানে অভিনীত হয়। বলা বাহুল্য, নাটকখানি উর্দু থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল। উর্দু থেকে অনূদিত নাটক যে বাঙালি দর্শকেরা দেখবে না তা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় তাঁরা প্রসিদ্ধ বাঙালি নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে ও শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু শিশিরবাবুর সঙ্গে ম্যাডান কোম্পানির বনিবনাও হয়নি। পরে শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন মিলে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন। তাজমহলের প্রথম অবদান হচ্ছে 'আঁধারে আলো'। এই ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ছবিখানি প্রথম দেখানো হয়। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির দ্বিতীয় অবদান হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন'। এই ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ তারিখে ছবিখানি প্রথম দেখানো হয়। ওই বৎসরেই আগস্ট মাসে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি 'খোকাবাবু' নামে একখানি কমিক ছবি প্রদর্শন করেন। বিখ্যাত হাস্যাভিনেতা পরলোকগত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী এই ছবির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাজমহল কোম্পানির চতুর্থ ও সর্বশেষ চিত্র শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ'। ছবিখানি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে খোলা হয়, নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পরলোকগত

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রজগতে এই তাঁর প্রথম অবতরণ। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি যেরকমভাবে দ্রুত ছবির পর ছবি নির্মাণ করে চলেছিলেন তাতে আশা করা গিয়েছিল যে, সেটি শীঘ্রই একটি বড়ো প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন শোনা গেল, কোম্পানি উঠে গেছে।

ইতিমধ্যে প্রথম বাঙালি পরিচালক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় হায়দ্রাবাদে (দাক্ষিণাত্য) লোটাস ফিল্ম কোম্পানি নাম দিয়ে একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান করেছিলেন। এঁরা এক বছরের মধ্যে 'ইন্দ্রজিৎ', 'লেডি টিচার' ও 'বিজয় বসন্ত' নামে তিনখানি ছবি নির্মাণ করেন। তারপরে তাঁদের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

সে-সময় বাংলা দেশে ম্যাডান কোম্পানি একচ্ছত্র রাজত্ব করলেও বাঙালিরা তাঁদের ছবি খুব কমই দেখতে যেত। বাঙালি ফিল্ম কোম্পানিগুলি বাঙালি-সাধারণের মনে অনেক আশা জাগিয়ে তুলেছিল। ম্যাডান কোম্পানি দু-একখানি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চিত্ররূপ নির্মাণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে বঙ্কিমচন্দ্রকে খুঁচিয়ে মারা ছাড়া আর-কিছুই করতে পারেননি। তাঁদের অধিকাংশ ছবির গল্পের বিষয়বস্তু আমদানি করেছিলেন, অভিনয় হিসেবেও বাঙালি অভিনেতাদের কলাকৌশল উচ্চশ্রেণির ছিল। ছবিগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের ছবিগুলির চাইতে প্রয়োগনৈপুণ্য এবং রুচিজ্ঞান অনেক উন্নত শ্রেণির ছিল। কিন্তু অর্থ, একতা, কর্মকুশলতা ও ব্যবসায়বুদ্ধির অভাবে সে-সময় বাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানই দাঁড়াতে পারেনি।

এই সময় বোম্বাই শহরে অনেকগুলি চিত্রপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে ইম্পিরিয়াল, কৃষ্ণ, সাগর, সরোজ, রঞ্জিত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বোম্বাইয়ের ছবিগুলি ফোটোগ্রাফি এবং অন্যান্য টেকনিক হিসেবে বাংলা দেশের ছবির চেয়ে কিছু উন্নত হলেও অধিকাংশ গল্পেরই বিষয়বস্তু হাস্যকর হতো। প্রথম প্রথম তাঁরা ম্যাডানের মতনই পুরাণের গল্প নিয়েই আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই তাঁরা ছবিকে আরও বেশি জনপ্রিয় করবার জন্যে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করতে লাগলেন। ম্যাডানের ছবিতে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের কথা আগেই বলেছি, তখনকার দিনের বোম্বাইয়ের তৈরি প্রায় সব ছবিতেই থাকত একটা করে বদমাইশদের আড্ডা। খুব সম্ভব 'Mysteries of Paris' ছবির অনুকরণে এই আড্ডা তৈরি করা হতো। আড্ডায় থাকত মেয়েমানুষের নাচ-গান (নির্বাক হলেও), তারপরে হতো মারামারি। এই মারামারি একবার বাঁধলে সে আর থামতে চাইত না। এইসব ছবির দর্শকবৃন্দও ছিল অতি নিম্নশ্রেণির। ভদ্রলোক বাঙালিরা বোম্বাইয়ের ছবি প্রায় দেখতেই যেতেন না। মারামারি যতই ভয়ংকর হয়ে উঠত অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও উঠত খেপে। আরেকটা জিনিস ছিল চেসিং অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে ধরবার জন্য তার পিছু ধাওয়া করা। এই চেসিঙের সিনও প্রায় অধিকাংশ ছবিতেই থাকত। শত্রুর পিছনে মোটরগাড়িতে ধাওয়া করা হচ্ছে, কখনও-বা পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ মেরে নীচে পড়ছে, কখনও-বা জলে সাঁতার কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, শত্রুপক্ষ ধরা পড়ে পড়ে এমন সময় পিছলে

পালিয়ে যাচ্ছে। এর আর অন্ত নেই। দেখতে দেখতে দর্শকবৃন্দ উত্তেজিত হয়ে বেঞ্চি চাপড়াতে আরম্ভ করত, কেউ-বা শিস দিত, প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সে এক হইহই ব্যাপার লেগে যেত।

সকলেই জানেন, বোম্বাইয়ের লোকেরা কর্মতৎপরতায় আমাদের চেয়েও অনেক উচ্চে। অনেকসময় সেখানকার চিত্র-নির্মাতারা পনেরো-বিশ দিন কিংবা এক মাসের মধ্যেই একখানা তেরো-চোদ্দো হাজার ফিটের ছবি তৈরি করে ফেলতেন। এইসব ছবি তৈরি করার পদ্ধতিও ছিল বিচিত্র। যাঁরা এরকম ছবি করেছেন, তাঁদের দু-একজনের কাছ থেকে যা শুনেছি তার একটু নমুনা দিলে পাঠকবর্গ চমৎকৃত হবেন।

ধরুন, কোনো পরিবেশক (distributor) কোনো চিত্রনির্মাতার (producer) কাছে একখানা নূতন ছবির জন্য বিশ হাজার টাকা অগ্রিম দিলেন, পরিবেশক এই সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর এই ছবির মধ্যে অমুক অমুক অভিনেতা অমুক অমুক অভিনেত্রী চাই-ই-চাই। শুধু তাই-ই নয় কতখানি মারামারি, কতখানি চেসিং এবং কতটা নাচ থাকবে এবং মোটামুটি গল্পের ধাঁচটা কীরকম হবে তার একটা আন্দাজ দিয়ে দিল। ছবিটা হয়তো দিন পনেরোর মধ্যেই শেষ করে দিতে হবে। হয়তো রাত্রি বারোটার সময়ে হোটেলে বসে এইসব কথাবার্তা হল।

পরের দিন সকাল বেলায় স্টুডিয়োর মালিক দু-তিনজন ক্যামেরাম্যানকে দু-তিন লোকেশনে পাঠিয়ে দিলেন শুটিং করতে। মুখে মুখে বলে দিলেন হাজার খানেক ফিট চেসিং ও অন্যান্য যা কিছু তুলে নিতে। ইতিমধ্যে পরিচালক এবং গল্প লিখিয়েকে নিয়ে

তিনি নিজেই একটা গল্প তৈরি করে ফেললেন। এই সঙ্গে এ-কথাও বলে রাখা ভালো যে, তখনকার দিনে, শুধু তখনকার দিনে কেন সবাক যুগেও প্রায় ৪০-৪৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি বোম্বাইয়ের স্টুডিয়োর মালিকেরা প্রায় সকলেই ছিলেন একেকটি সবজান্তা লরেন্স। কিন্তু থাক সে-কথা, পরে বলব। দিন পনেরোর মধ্যেই সমস্ত দিনরাত খেটে ছবি একরকম তৈরি হয়ে গেল। স্টুডিয়োর মালিকই কেটেকুটে তাকে এডিট করলেন। সেন্সারদের দুপুর বেলাই নেমন্তন্ন করা হল। সেই থেকে রাত্রি ১২টা অবধি পানে ভোজনে তাঁরা এমন আপ্যায়িত হলেন যে, ছবি না দেখেই পাশ করে দিতে বিশেষ আপত্তি করলেন না।

ভারতীয় সিনেমাশিল্প যখন এই সময় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে (যদিও এখনও সে খুঁড়িয়েই চলেছে) তখন ইউরোপ ও আমেরিকার সিনেমাশিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে ইউরোপের ফরাসি কোম্পানিদের ছবি ভারতে আসত। পাথে কোম্পানির এজেন্ট ছিল ভারতবর্ষে এবং তারা অধিকাংশই হাসির ছবি আমদানি করত। কিন্তু প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর ফরাসি চলচ্চিত্রশিল্প একেবারে অস্তাচলে গেল বলেই মনে হল। সে-বারকার যুদ্ধে প্রায় সবদিক দিয়েই ফরাসি জাতির যা ক্ষতি হয়েছিল আজও পর্যন্ত তারা তা সামলে উঠতে পারেনি। সেই যুদ্ধের পর রুশীয় চিত্রশিল্পের কথা এ-দেশে খুবই শোনা যেত। কোনো কোনো বইয়ে এবং ইউরোপ-ফেরত ভারতীয়দের কথাবার্তায় এবং গুজব সম্রাটদের অনুগ্রহে রুশ চলচ্চিত্র এ-দেশে

খুব আসর জমিয়েছিল। শোনা যেত, সে নাকি এক বিরাট ব্যাপার। যেমন আশ্চর্য তাদের গল্প বলার কৌশল তেমনি আশ্চর্য তাদের যান্ত্রিক টেকনিক। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় যেটি ছিল সে হচ্ছে রুশ চলচ্চিত্র এ-দেশে তখনও কেউ দেখেনি, এর অনেক পরে রুশ চলচ্চিত্র এ-দেশে কয়েকখানি দেখানো হয়েছিল, তার আলোচনা এখানে আর করব না।

যুদ্ধের ফলে জার্মানিদের সবদিক দিয়েই ক্ষতির পরিমাণ কিছু কম হয়নি। কিন্তু তারা শিগ্‌গিরই সামলে উঠে চলচ্চিত্রশিল্পে ইউরোপে তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলই, এমনকী কোনো কোনো বিষয়ে মার্কিন ফিল্মশিল্পের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করতে লাগল। ওদিকে যদিও ফরাসিরা সর্বস্বান্ত হয়েছিল বটে এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে তারা পিছিয়ে পড়লেও সেই শিল্পের অন্যান্য বিভাগে অর্থাৎ ক্যামেরা-ফিল্ম তৈরি এইসব ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল।

আগেই বলেছি, এই সময়ে মার্কিন দেশ ফিল্মশিল্পে চরম উন্নতি লাভ করেছিল। এ-কাজ তাদের একার দ্বারা সম্ভব হয়নি। তাদের দেশের ধনীরা যেমন অনেক দায় কাঁধে করে এই শিল্পে টাকা ঢেলেছিলেন, তেমনি ইউরোপের নানা দিক থেকে প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং বৈজ্ঞানিক তাঁদের চারিপাশে এসে জড়ো হতে লাগলেন। এঁদের সকলের সমবেত চেষ্টায় ফিল্মশিল্প হু-হু করে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে লাগল।

আমাদের ভারতীয় চিত্রশিল্পে কি গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন কিংবা শিল্পের অন্যান্য বিভাগের কোনো দিকেই একমাত্র অনুকরণ ছাড়া

তখনও আর-কিছুই করা হয়নি। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা খুব কম নয়। আমাদের শিল্পপতিরা যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমাদেরও ফিল্মশিল্পে দান কিছু কম হতো না। কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রের মধ্যে একমাত্র অর্থ উপার্জনের প্রয়াস ছাড়া আজ পর্যন্ত কিছুই পরিলক্ষিত হয়নি। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, আজ ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রশিল্পের দৌলতে বহু লোক সংসারযাত্রা নির্বাহ করছে। আমাদের গভর্নমেন্ট এই শিল্পের মাধ্যমে অনেক অর্থ গ্রাস করেছেন, কিন্তু সেদিক দিয়ে তাঁরাও এই শিল্পের জন্য কিছু করেছেন বলে আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে সে-সময় আরও একটি ব্যাপার জাজ্বল্যমান হয়ে ফুটে উঠত— সেটি হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অভাব। ইউরোপ কিংবা আমেরিকার সঙ্গে তুলনায় এই অভাবটি আরও বিশেষ করে চোখে পড়ত। গ্রিফিথ, সিসিল বি ডি'মিলো প্রভৃতি পরিচালক, কার্ক ডগলস ফেয়ার ব্যাঙ্কস, গ্রেটা গার্বো, মেরি পিকফোর্ড, রুডলফ ভ্যালেনটিন, লনচ্যানি, চার্লি চ্যাপলিন কত নাম করব— এঁদের অদ্ভুত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সে-দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের যে-উন্নতি হয়েছিল আমাদের দেশে তার তুলনা কোথায়! বস্তুত ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত এ-ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব হয়নি যাঁর সঙ্গে উপরোক্ত মহারথীদের কোনোরকম তুলনা হতে পারে।

ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রশিল্পের মধ্যে এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অতি সামান্য হলেও একজনের নাম করা যেতে পারে, তিনি হচ্ছেন পরলোকগত হিমাংশু রায়। হিমাংশু রায় এখনকার পড়াশুনো

শেষ করে বিলেতে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। কিছুদিন বিলেতে কাটাবার পর তিনি সেখানকার কোনো কোনো নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। হিমাংশু রায়ের বিলেত যাত্রা করবার অনেক আগে এখানকার খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল বিলেতে গিয়েছিলেন। নিরঞ্জনবাবু যখন বিলেতে যান তখন তিনি বালকমাত্র। আমার যতদূর মনে পড়ে, সেটা বোধ হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ। নিরঞ্জনবাবু গিয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। কিছুদিন সেখানে কাটাবার পরে তিনি রঙ্গমঞ্চের ওপর প্রভাবশালী কয়েকটি ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। এর পরেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ দেখা যায়। ফলে ডাক্তারি পড়বার সম্পর্ক ত্যাগ করে পুরোপুরি সাহিত্যিকে পরিণত হলেন। নিরঞ্জনবাবু রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক এবং চলচ্চিত্রের জন্য সিনেরিয়ো লিখেই সেখানে জীবিকা অর্জন করতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যান্ডের কোনো একটা সিনেমা কোম্পানিতে তিনি কায়েমিভাবে সিনেরিয়ো লেখক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এমন সময়ে হিমাংশু রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

শুনেছি এই সময়ে হিমাংশুবাবু লন্ডনে কোনো এক নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করেন। কোনো ভারতীয়ের পক্ষে ইংলন্ডীয় কোনো নাট্য সম্প্রদায়ে যোগদান করা যে কীরূপ কঠিন ব্যাপার তা এখনকার লোকেরা ধারণায় আনতে পারবে না। এই সময়ে তাঁকে অনেক কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। তাঁকে নাকি দিনের পর দিন শুধুমাত্র কাটা সৈনিকের ভূমিকায় নামতে হয়েছে। কিন্তু কোনোরকম দুর্দশাই তাঁকে দমাতে পারেনি। তাঁর অদম্য

উৎসাহ, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং বৈদগ্ধ্য ও বাক্‌পটুতা দ্রুতগতিতে তাঁকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে হিমাংশু রায় ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এখানে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে। তিনি জার্মানির বিখ্যাত U.F.A. কোম্পানির সঙ্গে কী একটা বন্দোবস্ত করেন। তার ফলে তাঁরা তাঁকে পরিচালক ও অন্যান্য টেকনিশিয়ান জোগান দিয়েছিল। তা ছাড়া বাকি অর্থের ব্যবস্থা তাঁকে এখান থেকে করতে হয়েছিল। খুব সম্ভব দিল্লির কোনো কোনো ধনী এ-বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

হিমাংশু রায়ের চিত্রনির্মাণের জন্য ভারতবর্ষে এই আগমন ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অনেকগুলি কারণে চিরজাজ্বল্য থাকবে। প্রথমত সে-যুগে এখানকার চলচ্চিত্রের জন্য যেসব জায়গা থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করা হতো, হিমাংশুবাবু সেসব স্থান থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ না করে ভদ্রসমাজের মেয়েদের এই দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রায় সকল প্রদেশ থেকেই অনেকগুলি শিক্ষিতা মেয়ে তাঁর এই প্রচেষ্টার সাহায্যে অগ্রসর হয়েছিলেন।

প্রথম বার হিমাংশুবাবু স্যার এডুইন আর্নলডের বিখ্যাত কাব্য 'The Light of Asia' অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনচরিত চিত্রে রূপায়িত করেন। সিনেরিয়ো করেছিলেন শ্রীনিরঞ্জন পাল। এই কাজে পাল মহাশয় প্রায় বিশ বছর বাদে দেশে ফিরলেন। হিমাংশুবাবু নিজে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীমতী সীতা দেবী। শোনা যায়, হিমাংশু রায় ও

তাঁদের পরিচালক এবং ক্যামেরাম্যান মিলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অনেক মেয়ে দেখে তার মধ্য থেকে শ্রীমতী সীতা দেবীকে তাঁদের কাজের উপযোগী বলে নির্বাচন করেছিলেন। সীতা দেবী এঁর আসল নাম নয়, ইনি ছিলেন জাতিতে ফিরিঙ্গিকন্যা— নাম রিনি স্মিথ। ভবিষ্যতে ইনি আরও অনেকগুলি নির্বাক চিত্রে অভিনয় করেছেন।

সে-সময়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় মহাসমারোহে মনোমোহন রঙ্গমঞ্চকে 'নাট্যনিকেতন' নাম দিয়ে পরলোকগত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। সীতা নাটকে দৃশ্যপট, সেটিং, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও সখীদের সাজসজ্জা গহনা প্রভৃতির পরিকল্পনা করেছিলেন শিল্পী শ্রীচারুচন্দ্র রায়। চারুবাবু ছিলেন হিমাংশু রায়ের সতীর্থ। তিনি তাঁর এই চিত্রের জন্য চারুবাবুকে ডেকে নিলেন। 'নাট্যনিকেতন' থেকে আরেক জন তখন হিমাংশু রায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন পরিচালক প্রফুল্লকুমার রায়। প্রফুল্লবাবু সে-সময়ে 'সীতা' নাটকে শম্বুকের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। প্রফুল্লবাবুর স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার, তাঁর সুন্দর সুগঠিত পেশিবহুল দেহ দর্শক-সাধারণের মনোরঞ্জন করত। প্রফুল্লবাবু এই চলচ্চিত্রে দেবদত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। শুধু অভিনয় নয়, তিনি চিত্রনির্মাণের ব্যবস্থাপনায় অশেষ সাহায্য করেছিলেন।

তখনকার দিনে দেশীয় রাজ্যগুলি যে কী চিজ ছিল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে তা বলে বোঝানো অসম্ভব। ভবিষ্যতে এ-সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলব। বোধ হয়

এই কারণেই হিমাংশুবাবু চিত্রনির্মাণের কাজ আরম্ভ করবার আগেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে এসে সোজা বড়োলাটের সঙ্গে দেখা করে যাতে দেশীয় রাজ্যসমূহ থেকে এ-বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তখনকার দিনে রাজপুতানার রাজ্যসমূহের এজেন্ট জেনারেল ছিলেন ওগিলভি সাহেব। তাঁর কাছে সিমলে থেকে খাড়া হুকুম এল যাতে সমস্তরকম সাহায্য তাঁকে দেওয়া হয়। তখনকার দিনে কোনো বাঙালির পক্ষে এই কাজ করা কীরকম শক্ত ব্যাপার ছিল তা বোধ হয় বিশেষ করে বলতে হবে না।

'লাইট অব এশিয়া' চিত্র তোলা হয়েছিল জয়পুর শহরে এবং শহরের আশেপাশে আম্বের প্রভৃতি জায়গায়। জয়পুর রাজ্যের গভর্নমেন্ট তাঁদের লোকলশকর, গাড়ি-রথ, উট-ঘোড়া-হাতি, সৈন্যসামন্ত, তাঁবু-হাতিয়ার প্রভৃতি যা-কিছু প্রয়োজন সরবরাহ করেছিলেন। ছবির কিছু পরিমাণ তোলা হয়েছিল বুদ্ধগয়ার মন্দিরে।

এই ছবির প্রায় সমস্তটাই আউটডোরে তোলা হয়েছিল। জার্মানি থেকে যেসব ক্যামেরাম্যান এই ছবি তুলতে এসেছিলেন, তাঁরা ভারতবর্ষের বিশেষ করে রাজপুতানার দারুণ রোদের সঙ্গে পরিচিত না হলেও ক্যামেরার কাজ খুবই ভালো হয়েছিল বলতে হবে। ওস্টেনসাহেব তাঁর পরিচালনায় কোনোরকম কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। অভিনয়ের দিক থেকে হিমাংশু রায়কে বুদ্ধদেবের ভূমিকায় চমৎকার মানিয়েছিল, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর দীর্ঘ দেহ ও সুন্দর মুখাবয়ব দর্শক-সাধারণকে আকৃষ্ট করলেও অভিনয়ের মধ্যে কোনো আবেদন

বা প্রাণস্পর্শিতা ছিল না। মোটকথা একমাত্র প্রফুল্ল রায় ছাড়া অভিনয়ের দিক দিয়ে কেউ কোনো নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি। ছবিখানি তোলার কাজ শেষ হয়ে যাবার পরে হিমাংশু রায় ও U.F.A.-এর টেকনিশিয়ানরা এক্সপোজড ফিল্ম নিয়ে ইউরোপে ফিরে গেলেন এবং শ্রীনিরঞ্জন পাল কলকাতায় এলেন।

আগেই বলেছি যে, পাল মহাশয় এর প্রায় ২০ বছর আগেই বিলেত গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ২-১ বার বিলেতে পিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু এতাবৎকাল তাঁদের পরিবারের অন্যান্য কারুকেও তিনি দেখেননি। বহুদিন পরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তাঁর এই কলকাতায় আসা। হিমাংশু রায় ও নিরঞ্জন পাল প্রভৃতি মিলে বিলেতে একটি নাট্য-সম্প্রদায় খুলেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের নাম রাখা হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স লিমিটেড', তাঁরা পাল মহাশয়ের 'গডেস' নামক একখানি নাটকে অভিনয় করে নাকি খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নিরঞ্জন পাল কলকাতায় এসে আবার সেই ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স লিমিটেড-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময়ে একদিন দ্বিপ্রহরে সুখে নিদ্রা দিচ্ছি এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নিরঞ্জন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমার অন্যতম বন্ধু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও চিত্রপরিচালক শ্রীচারুচন্দ্র রায় ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স লিমিটেড-এ যোগদান করেছিল। তার মুখেই নিরঞ্জন আমার নাম শুনে দেখা করতে এসেছিল। সে আমার বাল্যবন্ধু, ছেলেবেলার অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুব

ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য ছিল। তার পিতা স্বনামধন্য স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আমার বাবাকে চিরদিন ভাইয়ের মতো স্নেহ করেছেন। বিশ বছর পর তাকে দেখলাম তার কোনো পরিবর্তনই হয়নি। তিন বছর বিলেতে বাস করে মানুষের সবদিকেই ঘোরতর পরিবর্তন হয়— এই-ই আজীবন দেখে আসছি। অবিশ্যি এখনকার কথা স্বতন্ত্র। সেই বিশ বছর আগে বিদায়ের দিনে তাকে যেমনটি দেখেছিলুম সেদিন তা-ই দেখলুম। এ-কথা সে-কথার পর আমাকে ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স লিমিটেডে যোগদান করবার জন্য আহ্বান করলে। বলাবাহুল্য আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হলুম।

বিলেতে ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স-এ যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই Himanzurai Productions-এ চোখ দিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এখন তাদের মধ্যে অনেকেই আবার এই নূতনভাবে গঠিত ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স লিমিটেডে যোগ দিলেন। 'লাইট অব এশিয়া' প্রোডাকসন্সের নায়িকা শ্রীমতী সীতা দেবী এবং তাঁর অন্য দুই ভগ্নীও এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীমতী সীতা দেবীকে 'গডেসেস' নাটকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। অনেকে শুনে আশ্চর্য হবেন যে, শ্রীমতী সীতা দেবীর মাতৃভাষা ইংরেজি হলেও সে-সময় তাঁর ইংরেজি অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না, তাঁর মা তাঁকে মুখে বলে পার্ট মুখস্থ করিয়ে দিতেন।

ভবানীপুরে পূর্ণ থিয়েটার ভাড়া নিয়ে 'গডেসেস' নাটকের জোর রিহার্সাল চলতে লাগল। অনেকে শুনে হয়তো বিস্মিত হবেন যে, এই নাটকের সংগীতাংশ রচনা করেছিলেন শ্রীযুক্ত মধু বোস। মধুবাবু এই বছরেই সিনেমার কাজ শিখতে জার্মানি যাত্রা করেন।

কিছুদিন মহড়া দেবার পর এম্পায়ার থিয়েটার স্টেজে 'গডেসেস' নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। এই প্রসঙ্গে একটি মজার কথা মনে পড়ছে, সেটা উল্লেখ করলে অনেকে উপভোগ করবেন বলে মনে হয়। 'গডেসেস' নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য সমস্ত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রণ করতে হয়েছিলই, তা ছাড়া আমি নিজে গিয়ে বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু মহাশয়কে নিয়ে এসেছিলুম।

অভিনয়ের মাঝখানে একবার ইন্টারভ্যালের সময়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম— কীরকম দেখছেন স্যার? ভালো লাগছে?

আমার কথা শুনে অমৃতবাবু একটু হেসে বললেন— দেখো হে, তোমায় একটা কথা বলি। তোমরা জন্মাবার অনেক আগে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন বসু একবার কলকাতার তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান স্যার স্টুয়ার্ট হগকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন কলকাতা শহরের চারিদিকে এই যে ময়লা এখানে-সেখানে পড়ে আছে, এ কি হগ সাহেবের চোখে পড়ে না?

এই অসমসাহসিক উক্তির জন্য আমরা তোরণ করে, বিরাট সভা করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলুম। আমরা হলুম সেই যুগের লোক। তোমরা সাদা চামড়ার মেয়েদের সঙ্গে ইংরেজরা যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে সেই রঙ্গমঞ্চে ইংরেজি ভাষায় অভিনয় করছ আমাদের কাছে এই যথেষ্ট, ও আর ভালো-মন্দ কী বলব?

এইখানে ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স-এর অবতারণা করা অনেকের কাছে অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু 'ছায়ালোকের কথা'র সঙ্গে তার কিছু যোগ আছে।

দিন সাতেক এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনয় হবার পর ঠিক হল এবার আমরা দিগ্‌বিজয় করতে বেরুব। বোম্বাই, পুণা, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানের স্টেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লেখালেখি চলতে লাগল। এই সময়ে নিরঞ্জন পাল মহাশয় আবার বিলেতে ফিরে গেলেন।

অর্থের দিক দিয়ে এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনয় করে আমাদের খরচ সব ওঠেনি। শুনলুম বোম্বাইয়ের লোকেরা নাকি ইংরেজি অভিনয় সম্বন্ধে বেশি আগ্রহশীল। সেখানে প্রভূত অর্থেরও আমদানি হতে পারে। বোম্বাই শহরে মারাঠি, গুজরাতি, পারসি, বোরি, খোজা প্রভৃতি সকলেই ইংরেজি অভিনয় সম্বন্ধে উৎসুক। এই আশ্বাস পেয়ে কিছুদিন পরে আমরা সকলে কোট-প্যান্ট চড়িয়ে বোম্বাই শহরের দিকে যাত্রা করলুম।

বোম্বাইয়ের রয়াল অপেরা হাউস-এর মালিক ছিলেন সে-সময়ে মিস্টার করাকা। তিনি প্রায় দশ লক্ষ টাকা খরচ করে সে-যুগে এই গৃহ তৈরি করিয়েছিলেন এবং সমস্ত ভারতে সে-সময়ে এর মতন সুন্দর প্রেক্ষাগৃহ আর ছিল না। মিস্টার করাকা থিয়েটারের উদ্দেশ্যে এই গৃহ প্রথমত তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু থিয়েটার করে ও থিয়েটারওয়ালাদের ভাড়া দিয়ে খরচ চলছে না দেখে শেষকালে বাধ্য হয়ে সেটাকে সিনেমাগৃহে পরিণত করেছিলেন। আমরা মিস্টার করাকার সঙ্গে ব্যবস্থা করে এই রয়াল অপেরা হাউসটি কয়েক দিনের জন্যে ভাড়া নিয়েছিলুম। কথা ছিল প্রথম শো হয়ে যাবার পর অর্থাৎ রাত্রি ন-টার পর আমাদের অভিনয় আরম্ভ হবে।

প্রথম দিন থিয়েটার আরম্ভ হতে-না-হতেই গ্যালারি থেকে অদ্ভুত আওয়াজ সব শোনা যেতে লাগল। কুকুর ডাকা, ব্যাঙ ডাকা, শেয়াল ডাকা, মেগাফোনের সাহায্যে গাঁক গাঁক করে চিৎকার করা— সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। প্রেক্ষাগৃহ প্রায় পূর্ণই ছিল, অর্থাগমও মন্দ হয়নি, ভিড়ের দৃশ্যে সেখানকার বাঙালি বাসিন্দারা অনেকেই অভিনয় করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তা হলে কী হয়। তেতলার সেই গ্যালারির চিৎকারে সমস্ত ব্যাপারটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলতে হবে। ওখানকার কয়েকটি বিশিষ্ট নাগরিক আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে পুলিশের বড়োকর্তাকে এই বিষয়ে জানালেন। অবশ্য ব্যাপারটা গোপনেই হয়েছিল। পরের দিন অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বেই প্রেক্ষাগৃহের প্রায় সর্বত্রই, বিশেষ করে গ্যালারিতে, ছদ্মবেশে পুলিশ মোতায়েন রাখা হল। অভিনয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই গোলমাল শুরু হল, পুলিশ প্রথমটা গোলমাল বাড়তে দিলে, তারপরে চরমে পৌঁছাতেই তারা সেই লোকগুলোকে ধরে— তা প্রায় জন পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে— বাইরে টেনে চোরের মার মারতে আরম্ভ করে দিলে। সে-দৃশ্য দেখতে না পেরে শেষকালে আমরাই পুলিশের হাতে-পায়ে ধরে তাদের মার বন্ধ করেছিলুম।

কিছুদিন পরের কথা। আমরা সকলে শঙ্কিত হৃদয়ে প্রফুল্লর অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগলুম। সে যে সেই তার করেছিল, তারপরে আর কোনো সংবাদ নেই। এদিকে দিনে দিনে বাজারদেনা বেড়েই চলেছে। দেনা পাবারও একটা সীমা আছে। সে-সীমাও প্রায়

লঙ্ঘিত হয়েছে, এমন সময় বোধ হয় দশ-বারো দিন পরে একদিন সকাল বেলা দেবদূতের মতো প্রফুল্ল এসে হাজির হল। খাজুলালকে বধ করে সে হাজার কয়েক টাকা নিয়ে এসেছিল, তা-ই দিয়ে তখনকার মতো কোনো রকমে সেখানকার দেনা শোধ করে তৃতীয় শ্রেণিতে চড়ে কোনো রকমে যে-যার বাড়িতে রওনা হল।

বিদেশবিভুঁয়ে এইভাবে বানচাল হয়ে ভি পি যোগে বাড়িতে ফিরে আসা আমার জীবনে বহুবার ঘটেছে। কিন্তু এতগুলি লোক নিয়ে বিদেশে কোম্পানি বানচাল হলে যে কী অবস্থা ঘটে এ-ক্ষেত্রে তারও অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার কথা পাঠকবর্গকে উপহার দিচ্ছি।

অনেকদিন আগে শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী তখন মহাসমারোহে 'সীতা' নাটক অভিনয় করছিলেন, আমরা কয়েকজন ওয়েলিংটন স্ট্রিটে শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের বৈঠকখানায় বসে থিয়েটার, সার্কাস, অভিনয় এবং বিশেষ করে শিশিরকুমারের অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। বসুমতীর স্বত্বাধিকারী পরলোকগত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের এই আলোচনায় যোগ না দিয়ে তিনি মৌনভাবে বসে আছেন দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম— সতীশবাবু কিছু বলছেন না যে?

সতীশবাবু বললেন— দেখুন, ওইসব থিয়েটার বায়োস্কোপ সার্কাস— এইসব ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নাই।

জিজ্ঞাসা করলুম— কেন? আগ্রহ না থাকবার কোনো কারণ আছে কি?

তিনি বললেন— আছে, নিশ্চয়ই আছে। আমার বাবা এইসব ব্যাপারের পেছনে যে কত পয়সা নষ্ট করেছেন, তা বলা যায় না। তিনি নষ্ট করেছেন বললে ভুল হবে, তাঁকে ঠকিয়েছে। লোকে মেরে দিয়েছে। তিনি নিজের বিপুল ব্যাবসা ছেড়ে অন্যদিকে নজর দিতে পারতেন না, লোকে তাকে ঠকিয়ে নিত। একটা ঘটনার কথা শুনুন। বাবাকে তাঁর বন্ধুরা মিলে Hipodrome সার্কাসের একজন অংশীদার করলেন। যখন জোর চলছিল তখন তিনি একটা পয়সাও পেলেন না। তারপরে ব্যাবসাতে মন্দা পড়তে লাগল। সার্কাস তখন বোম্বাই অঞ্চলে সফল করছে। অবস্থা খারাপ হতে হতে 'মানমাদে' এসে ব্যাবসা একেবারে বানচাল হয়ে গেল। সার্কাসে দু-পাঁচশো লোক, তারা মাইনে পায় না। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, কুকুর, বেড়াল— এরা পায় না খেতে। অবস্থা দেখে কর্তৃপক্ষরা যে-যার সরে পড়লেন। মানমাদ একটি ছোটো শহর, সেই শহরে সার্কাসের হাতি, ঘোড়া, কুকর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে এক বীভৎস ব্যাপার, শেষকালে বাবা এখান থেকে ছুটলেন সেখানে। জন্তু-জানোয়ার কতক বিলিয়ে দিলেন। কতক জলের দরে অর্থাৎ হাজার টাকার ঘোড়া দশ টাকায় বিক্রি করে তখনকার মতো পাওনা চুকিয়ে ফিরে এলেন। ব্যাপারটা একবার হৃদয়ঙ্গম করুন।

অবিশ্যি আমাদের কোম্পানির অবস্থা এরকম বানচাল হয়নি, তবে হবার পুরো সম্ভাবনা ছিল। হাতি-ঘোড়ার বদলে আমরা মানুষরাই হয়তো খাবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম। ভগবান শেঠ খাজুলালকে মেরে আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন।

আমার একটা গল্প অনেকদিন আগে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা ঠিক করলুম সেই গল্পটির চিত্ররূপ দিতে হবে। গল্পটার নাম 'নিশির ডাক'। গল্পটির পটভূমি ছিল রাজপুতানার উদয়পুর রাজ্য। আমি ও পিলে পুণায় বসে বসে এর খানিকটা সিনেরিয়ো তৈরি করেছিলুম। কলকাতায় ফিরে এসে অবশিষ্ট অংশের সিনেরিয়ো করতে আরম্ভ করলুম। ওদিকে হায়দ্রাবাদ থেকে পিলে খুব আশা নিয়ে চিঠি লিখতে লাগল—আজ একজন কোটিপতির সঙ্গে কথা হয়েছে, দুজন মহা ধনী লোক জালে আটকা পড়েছেন। এখন তাঁদের খেলিয়ে উপরে তুলতে পারলে হয় ইত্যাদি। পিলের চিঠিতে আমরা খুবই আশান্বিত হয়ে উঠতে লাগলুম, কিন্তু শেষকালে আমাদের ভাগ্যে সে কোনো ধনীকেই খেলিয়ে তীরে তুলতে পারল না। শেষকালে একদিন সে লিখলে, এখানকার চাইতে কলকাতায় গিয়ে চেষ্টা করলে হয়তো অনেক তাড়াতাড়ি কোম্পানি গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে। পিলেকে আমরা কলকাতায় আসতে চিঠি লিখে দিলুম। শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে জানি না, একদিন দুপুর বেলা মাদ্রাজ মেলে পিলে কলকাতায় এসে উপস্থিত হল।

পিলে এসে চারুর (শ্রীচারুচন্দ্র রায়) বাড়িতে উঠল। সেইখানে বসে আমরা ক-জনে মিলে কোম্পানির খসড়া তৈরি করতে লাগলুম। ফিরিঙ্গিমহলে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন বন্ধু ছিলেন, তাঁরা খুবই উৎসাহ দিতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে মিস্টার অ্যানড্রুজ এবং মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে অগ্রণী হলেন। এঁরা আশ্বাস দিলেন বাঙালি কিংবা মাড়োয়ারি

মহলে চেষ্টা করবার প্রয়োজন নেই। পাঁচ লাখ টাকা তাঁরা নিজেদের মধ্যে থেকেই তুলে দেবেন। হপ্তার মধ্যে তিন-চার দিন করে আমরা সন্ধ্যার সময় মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক-এর বাড়িতে জমায়েত হতুম। এঁরা দুজনেই ছিলেন অতিরিক্ত কল্পনাবিলাসী। টাকার জোগাড় হবার আগেই কী কী ছবি তোলা হবে কি, হিরোইন হিসাবে কাকে কাকে মাইনে দিয়ে রাখা হবে; ভারতবর্ষের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নানানরকম টপিক্যাল ফিল্ম তুলে বিদেশে পাঠানো হবে, শুধু ভারতবর্ষ নয়, আফ্রিকার জঙ্গল, ধ্বংসপ্রায় পম্পেই শহরে ও ইউরোপে নানান জায়গা থেকে টপিক্যাল ফিল্ম তুলে এনে ভারতবর্ষের দর্শকদের দেখানো হবে, দেখতে দেখতে আমরা ধনী হয়ে উঠব— এইসব কল্পনায় সেদিনকার সেই সন্ধ্যাগুলো কাটত ভালো।

মনে পড়ে মিস্টার অ্যানড্রুজ-এর সঙ্গে কোথায় খিদিরপুরে কোন ব্যাবসাদার আছে, গোরাচাঁদ রোডে কে একজন আছে, সে খুব ভালো মেমোরেন্ডাম লিখতে পারে— রিপন স্ট্রিট, লিন্টন স্ট্রিট এইসব জায়গায় ঘুরে ঘুরে পায়ে ব্যথা ধরে গেল। কেউ-বা এমন গম্ভীর যে দু-ঘণ্টা বকে গেলে একটা কথার উত্তর পাওয়া যায় না। কেউ-বা এমন বক্কেয়ার যে তাকে কিছু বলবারই অবসর পাওয়া যায় না— নিজেই সব কথা বলতে থাকে। কেউ-বা একেবারে দমিয়ে দেয়। কেউ-বা আশার উচ্চ শিখরে তুলে দেয়। অ্যানড্রুজ-এর পাল্লায় পড়ে আমরা তো হাঁপিয়ে উঠলুম।

মেসার্স অ্যানড্রুজ অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক কোম্পানির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমাদের জুতো, পেন্টুলুন ও ট্যাঁকের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল,

তবুও অতি আকাঙ্ক্ষিত টাকার কোনো সুরাহাই হল না। মাস ছয়েক ঘোরাঘুরির পর অ্যানড্রুজ সাহেব সহসা উপলব্ধি করলেন যে, দুনিয়ায় কথা কেউ রাখে না এবং তিনি ও আমরা ক-জন ছাড়া সত্য কথা কেউ বলে না। আমাদের এতদিনকার আশায় ছাই পড়ল।

কিন্তু পিলে নিরুৎসাহ হল না। সে তখন এদিক-ওদিক ঘুরতে আরম্ভ করে দিলে। কারণ কোনো একটা কিছু না করে তার বাড়ি ফেরার মুখ নেই। আমরা যখন সকলেই নিরাশায় মুহ্যমান, সেইসময় ভগ্নতরীর কর্ণধাররূপে দেখা দিলেন শ্রীমান ঘনশ্যাম দাস চোখানি। তখন সে সদ্য বাপের বিষয়ের মালিক হয়েছে, ব্যাঙ্কে অনেক টাকা, পৈত্রিক ভালো ব্যাবসা, শরীরে অপরিমিত স্বাস্থ্য, ঘনশ্যাম আমাদের জীবনে ঘনশ্যামরূপেই উদিত হলেন। তাকে যে কে জোগাড় করেছিল সে-কথা ঠিক মনে নেই। রাওয়াল নামে এক ব্যক্তি সামান্য পরিবেশকের কাজ করত। তার বাড়ি গুজরাতের কচ্ছ অঞ্চলে। এখন বোধ হয় সিনেমাজগতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই, তখনও ছিল অতি অল্প। ঘনশ্যাম আমাদের সঙ্গে মিশলেও সে মাড়োয়ারির ছেলে এবং ব্যাবসা তার ধমনীতে ওতপ্রোত হচ্ছে— সে সোজাসুজি আমাদের সঙ্গে টাকার ব্যবস্থা না করে রাওয়ালকে রেখেছিল মাঝখানে। অর্থাৎ আমাদের যা-কিছু অর্থের প্রয়োজন তা আমরা রাওয়ালের কাছ থেকে পাব। সোজাসুজি কোনো পাওনার জন্যে ঘনশ্যামকে ধরতে পারব না।

আগেই বলেছি, পিলে আমাদের পরিচালকের কাজ করবে বলে ঠিক ছিল। আমরা ক্যামেরার কাজের জন্য সংগ্রহ করলুম নীতিন্দ্রমোহন বসুকে। নীতীন ইতিপূর্বে নিজে জার্মান ক্যামেরা কিনে খেয়ালমতো ছবি তুলত। তারপর সে ত্রিপুরা রাজ্যে হাতির খেদার ছবি তুলতে যায়। সেখানে হাতি ধরা এবং খেদার অন্য অন্য ব্যাপারের ছবি তুলে ইউরোপ আমেরিকায় পাঠাতে আরম্ভ করে। এই কাজে তার অর্থ এবং নাম দুই-ই হয়। ইতিপূর্বে সে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ কখনও করেনি। জঙ্গলে ছবি তুলতে গিয়ে সে একবার ভীষণ ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং অনেকদিন ভুগে সেরে উঠেছিল। তখনও সে শরীরে সম্পূর্ণরূপে শক্তি ফিরে পায়নি। আমরা রাজপুতানায় যাব শুনে এবং সেখানকার আবহাওয়ায় তার শরীরের উপকার হবে জেনে সে সহজেই আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। নীতিনের সহকারী এবং কর্মক্ষেত্রে ডার্করুমে কাজের জন্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন শ্রীযুক্ত মণি সান্যাল। প্রথমে আমেদ নামের একটি ছেলেকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু পরে আমেদকে অন্য পার্ট দেওয়া হয়। নায়কের ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য আমরা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে কয়েকজন মিলে অনুরোধ করায় তিনি রাজি হলেন। এখনও সিনেমাজগতে সমারোহের সঙ্গে বর্তমান আছেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অভিনেত্রী জোগাড় করা নিয়ে আমাদের বিশেষ মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। আমরা আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিলুম কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েকে নেব না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করার পর ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশের তো দূরের কথা, কোনো বাঙালি মেয়েকেই জোগাড় করতে পারলুম না। এর প্রধান কারণ ছিল আমাদের সঙ্গে রাজপুতানার সেই মরুপ্রদেশে যেতে কেউ রাজি হলেন না। অবশেষে বাধ্য হয়ে অভিনেত্রীর জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হল।

অনেক মেয়ের আবেদনপত্র আমরা পেয়েছিলুম। শেষকালে পিলে অনেক দেখে-শুনে একটি মেয়েকে নির্বাচন করলে। মেয়েটির বাবা আসানসোলে রেলের কাজ করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইউরোপিয়ান। মেয়েটি কিন্তু এখানেই জন্মেছে। তার মা বললেন, তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। সেখানকার থাকবার ব্যবস্থা দেখে ফিরে আসবেন। আরেকটি মেয়ে দরকার ছিল, তা কলকাতা থেকেই জোগাড় হল। সে কলকাতার কোনো এক সওদাগরি আপিসে শর্টহ্যান্ড টাইপিস্টের কাজ করে। আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হল আপিস থেকে কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে। মেয়েটি ছিল বেশ সুন্দর দেখতে এবং সিনেমায় নামার জন্য খুবই উৎসাহী। বাঙালি মেয়ে হলে সে ভবিষ্যতে সিনেমাজগতে নাম করতে পারত। কিন্তু তার যাবার প্রধান বাধা ছিলেন তার বাপ-মা। এতগুলি দাস-পাণ্ডা ছোকরার সঙ্গে কোন বাপ-মা-ই-বা তাদের সুন্দরী কুমারী মেয়েকে বিদেশে পাঠাতে চায়। শেষকালে অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর তাঁরা দাবি জানালেন

যে, আমরা যদি খরচ দিয়ে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, তবে তাঁরা রাজি হতে পারেন। কী করা যাবে, অগত্যা তাতেই রাজি হওয়া গেল।

তখনকার দিনে অর্থাৎ নির্বাক ছবির যুগে ছবি তোলায় অনেকরকম হাঙ্গামা ছিল। যা এখন নেই। প্রথম কথা আলোর হাঙ্গামা। তখন যাদের স্টুডিয়ো ছিল না এবং যাদের স্টুডিয়ো ছিল— এই উভয়পক্ষকেই প্রধানত নির্ভর করতে হতো সূর্যের আলোর ওপর। সমস্ত দিনের মধ্যে সূর্যালোকের ঔজ্জ্বল্য সমানভাবে থাকে না। তার ফলে ফোটোগ্রাফিও সমানভাবে হতো না। আলো দূরে নিক্ষেপ করবার জন্যে প্রথমত আয়না, তারপরে বড়ো ফ্রেমে বাঁধা নূতন টিন, এ ছাড়া টিনের ওপরে অ্যালুমিনিয়াম রঙের কাগজ মারা আরেকরকম রিফ্লেক্টার— যার দ্বারা আলোক ডিফিউসড করা হতো, অয়েল ক্লথের মতো একরকম অ্যালুমিনিয়াম রঙের কাপড়ও অনেক প্রয়োজন হতো। এই সমস্ত জোগাড় করে তারপরে কর্মস্থলে ফিল্ম ডেভেলপ করা ইত্যাদি ডার্করুমের কিছু কিছু সরঞ্জাম তৈরি করিয়ে সে এক বিরাট লটবহর নিয়ে আমরা প্রায় জন পঁচিশ এক অগ্রহায়ণের পয়লা তারিখে রওনা হলুম উদয়পুর রাজ্যের দিকে। পয়লা তারিখে রওনা হতে বাড়িতে এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীরাও বারণ করেছিলেন, কিন্তু সেসব কুসংস্কারের কথায় আমরা কান দিইনি। তার ফল পরে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলুম।

আমাদের কোম্পানির নামকরণ করা হয়েছিল দি ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস। আমরা মনে করেছিলুম কোনো একটা দিশি নাম

দেব কিন্তু পিলে বললে সে বিলেত থেকেই এই নাম ঠিক করে রেখেছে এবং কোম্পানির এই নাম না হলে সে বড়ো দুঃখিত হবে। এ অনেকটা বিয়ের আগেই ছেলের নাম ঠিক করে রাখা। মনে দুঃখ না দিয়ে তার দেওয়া নামই গ্রহণ করা হল।

আগেই বলেছি পয়লা অগ্রহায়ণ তারিখে আমরা উদয়পুর রাজ্যে রওনা হয়েছিলুম। আমরা হিসেব করে ঠিক করেছিলুম যে, মাস খানেকের মধ্যেই ওখানকার সমস্ত কাজ শেষ করে ফিরে আসব অর্থাৎ পৌষ মাস নাগাদ আমরা কলকাতায় ফিরে এসে বাকি কাজটুকু শেষ করতে পারব। এই এক মাসের জন্যে অনেকে তেমন গরম কাপড়জামা সঙ্গে নেননি। কলকাতা থেকে আমরা যে-মেয়েটিকে সংগ্রহ করেছিলুম তার মা খাস বিলিতি মেয়ে। তিনি স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ড প্রদেশের মেয়ে। তিনি বললেন, ওটুকু শীত আমরা গ্রাহ্যই করি না এবং সেজন্যে গরম কাপড়জামা নেবার কোনো প্রয়োজনই নেই। কিন্তু বাংলা দেশ ছাড়িয়ে বিহারে পড়তেই, যাঁরা গরম কাপড় আনেননি, তাঁরা বুঝতে পারলেন কী ভুলই করেছেন। যাহোক, তখন আর উপায় নেই, সেখানে গিয়ে কাপড়চোপড় কিছু কিনে নিলেই চলবে, এই ভেবেই মনকে আশ্বস্ত করলেন।

আমরা আগ্রা আজমির ঘুরে তিন দিন পরে প্রায় বেলা বারোটা নাগাদ উদয়পুর স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোলুম। আমাদের গাড়িতেই ছিলেন একদল আমেরিকান স্ত্রী ও পুরুষ। এই শীতের সময় আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে হাজার হাজার টুরিস্ট আসেন উদয়পুর রাজ্যে। সে-সময় রেলের কুলি থেকে আরম্ভ করে প্যালেসের চাকরবাকররা পর্যন্ত এমন গরম থাকে যে দিশি

লোকেদের প্রতি তারা চেয়েই দেখে না। ফলে গাড়ি স্টেশনে পৌঁছোবার পর আমরা মুশকিলেই পড়লুম। উদয়পুর ছোটো স্টেশন, সেখানে রেলের কুলিও কম আছে। তারা সব ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাদা চামড়াদের নিয়ে। তাদের মালপত্তরও বেশি নেই। একটা কি দুটো বিরাট সুটকেশ নিয়ে একজন বেরিয়েছে বিশ্ববিজয় করতে। আমাদের বিছানা বাক্স এসব তো আছেই, তা ছাড়া ছবি তোলবার সরঞ্জাম ইত্যাদি। সে বিরাট লটবহর কে মালের গাড়ি থেকে নাবায় ঠিকানা নেই। এদিকে স্টেশনমাস্টার তাড়া দিতে লাগল মালপত্র নামাবার বন্দোবস্ত তোমরা নিজেরা করো, নইলে ওসবসমেত গাড়ি সাইডিঙে চলে যাবে। আমাদের সব্যসাচী ছিলেন প্রফুল্লকুমার। সে তখুনি বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে আট-দশ জন লোক জোগাড় করে নিয়ে এল। তাদের দিয়ে রেল থেকে মালপত্তর নামিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে তো পৌঁছোনো গেল। উদয়পুর স্টেশন থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে উদয়পুর হোটেল। আমরা স্থির করেছিলুম উদয়পুর হোটেলে উঠব। বাইরে এসে দেখা গেল দু-একখানি ছাড়া টাঙ্গা একেবারে নেই। তারা সব গিয়েছে সাহেব-বিবিদের নিয়ে। ঘণ্টা দুয়েক বাদে কয়েকখানা টাঙ্গা ফিরে আসায় আমরা তারই ওপর মোটঘাট চাপিয়ে হোটেলের দিকে যাত্রা করলুম।

উদয়পুর হোটেলে গিয়ে দেখি সেখানে হইহই ব্যাপার। সাদা নর-নারীদের ভিড়ে তিল ধারণের ঠাঁই নেই সেখানে। হোটেলের বড়ো মাঠে ছোটো-বড়ো নানান রকমের তাঁবু পড়েছে। হোটেলের ম্যানেজার এদের তদারক করতে এত ব্যস্ত যে তাঁকে খুঁজে বার

করতেই ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। তখন বেলা প্রায় আড়াইটা কি তিনটে হবে, খিদে-তেষ্টায় সব টা-টা করছি, এমন সময় হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। সে এককথায় বলে দিলে— আমাদের এখানে জায়গা হবে না, দেখছেন তো, এক ফোঁটা জায়গা কোথাও নেই। তখন আমাদের 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' অবস্থা।

উদয়পুর হোটেলকে একরকম সরকারি হোটেল বলা যেতে পারে। উদয়পুর রাজ্যের জন কয়েক বড়োলোক এবং সেখানকার গভর্নমেন্টের সাহায্যে এই হোটেলটি তৈরি হয়েছে। হোটেলে যত যাত্রী আসে-যায়, তাদের কাছ থেকে দৈনিক দু-টাকা করে গভর্নমেন্ট পায়। হোটেলের অংশীদারদের মধ্যে একজন ছিলেন বাঙালি। তিনি উদয়পুর রাজ্যের একজন মন্ত্রী এবং পুরুষানুক্রমে তাঁরা এখানেই বাস করেন। ভদ্রলোকের নাম ঠিক মনে পড়ছে না— তবে সম্ভবত প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চাটুজ্জে মশায়ের বাড়ি হোটেলের কাছেই ছিল। আমরা তখুনি ফিরে তাঁকে ধরলুম। তিনি আমাদের সঙ্গে এসে হোটেলের ওই ভিড় দেখে মুশকিলেই পড়লেন। এদিকে ম্যানেজারকেও কিছু বলতে পারেন না, আবার আমরা বাঙালি বলে প্রত্যাখ্যান করতেও চক্ষুলজ্জায় বাধে। শেষকালে অনেক বাদানুবাদের পর ঠিক হল আমাদের মধ্যে যে কয়েকজন সাদা চামড়ার সাহেব-বিবি আছেন তাঁদের জন্য আপাতত তাঁবুর ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে, পরে লোক কমে গেলে হোটেলের ভেতর ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের বললেন— শহরের কাছে অনেকগুলি ধর্মশালা আছে, আপাতত সেখানে গিয়ে মাথা রক্ষে করুন, পরে দেখে-শুনে একটা বাড়ি ঠিক করে নিলেই চলবে।

অগত্যা আমরা শহরের দিকেই চললুম। শহরের কাছেই একটা ধর্মশালা আছে বটে, কিন্তু সেখানে আমাদের নাটকি লোক বলে উঠতে দিলে না। শহরের কাছেই জৈনদের একটি ধর্মশালা আছে, সেখানে বাঙালি বলে উঠতে দিলে না। শহরে আর ধর্মশালা নেই, শোনা গেল সেখানে বাড়ি ভাড়াও পাওয়া যায় না। উদয়পুর শহরে তখন বাঙালিদের পক্ষে বেশ শীত পড়েছে, বাইরে শুয়ে থেকে যে রাত্রিটা কাটিয়ে দেব তারও উপায় নেই। ওদিকে সন্ধ্যা সমাগত। আমরা আবার আজমিরে ফিরে যাব কি না গুরুতরভাবে সেটি পরামর্শ করতে লাগলুম। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলতে হবে। জৈনদের ধর্মশালায় কয়েকজন ভিক্ষুণী বাস করতেন। মুখে তাঁদের সূত্রাবরণী যা আমরা বাংলা দেশে কখনও দেখিনি। হাতে বড়ো বড়ো রজোপাসারিণী। তাঁরা ছিলেন মূর্তিমতী করুণা। তাঁরা অগ্রসর হয়ে এসে আমাদের অবস্থা শুনে এই মছলিখোর বাঙালিদের এক রাত্রির জন্য সেখানে মাথা গোঁজবার অনুমতি দিলেন। মালপত্তর ভেতরে তুলে, ঘর পরিষ্কার করে যখন আমরা স্থির হয়ে বসলুম তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উতরে গেছে। যাঁরা আমাদের থাকবার স্থান দিয়েছিলেন তাঁরা পইপই করে বলে দিয়েছিলেন সেখানে যেন আমরা খাওয়াদাওয়া না করি। কাজেই সন্ধ্যার পর আহারের সন্ধানে বাইরে বেরোনো গেল।

সারারাত্রি জন কুড়ি মিলে একঘরে গুঁতোগুঁতি করে রাত্রি প্রভাত হতেই আমরা দিকে দিকে ছুটলুম বাড়ির সন্ধানে। কিন্তু বাড়ি কোথায়! এ কি কলকাতা শহর? সেখানে ভাড়া দেবার জন্যে লোকে বাড়ি তৈরি করে না। ভাড়া দিয়ে থাকবে এত পয়সা কার

আছে? সরকারি কর্মচারীদের মাইনে অতি সামান্য, তাদের মধ্যেও দেশি লোকদের নিজেদের বাড়ি আছেই। বিদেশি লোকেরা, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট সরকারি বাড়িতেই বাস করে। যা দু-একটা বাড়ি দেখা গেল, ছোটো ছোটো অন্ধকার ঘর, তাতে মানুষের বাস করা অসম্ভব। কিন্তু সেখানকার লোকেরা অর্থাৎ দরিদ্র ও মধ্যবিত্তেরা গ্রীষ্মকালের সূর্যতাপ ও শীতকালের শৈত্য থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এইরকম ছোটো ছোটো অন্ধকার ঘরে বাস করে। বড়োলোকেরা বড়ো বড়ো খিলানওয়ালা ঘর করে রাখে, গ্রীষ্মকালে শোবার জন্য। সে যাই হোক, আমরা তো খুঁজে খুঁজে হাল্লাক হয়ে গেলুম কিন্তু বাড়ির সন্ধান করতে পারলুম না। বাড়ির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে নিরাশ হয়ে ধর্মশালায় যতবার ফিরে আসি ততবারই ধর্মশালার লোকেরা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় অর্থাৎ কী হে উঠবে কখন। অবশেষে বিপদ দেখে তারাই খুঁজেপেতে একটা বাড়ি ঠিক করলে। শহরের মধ্যেই বাড়ি, বাড়িটি দোতলা অর্থাৎ কিনা দোতলার ওপর একখানি ঘর, নীচে দুখানি অন্ধকার ঘর। বাড়ির অন্য ঘর আগেই ভাড়া দেওয়া আছে। বাড়িওয়ালা আমাদের অবস্থা দেখে এই দুটো অন্ধকার ঘর ও দোতলার একখানি ঘর ভাড়া হিসাবে একশো টাকা চাইলে। উদয়পুরের হিসেবে মাসে একশো টাকার বেশি তার ভাড়া হতে পারে না। তাও আবার বাড়িওয়ালাকে টাকাটা অগ্রিম দিতে হবে। আমরা তাতেই রাজি হয়ে অগ্রিম ভাড়া দিয়ে ধর্মশালা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে সেই বাড়িতে ফেললুম। নীচেকার ঘর দুখানায় ডার্করুম ও ড্রয়িংরুম করে ওপরকার ঘরখানায় জন দুয়েকের থাকবার ব্যবস্থা হল।

আবার পথে বেরিয়ে পড়লুম। সর্বপ্রথমে একবার উদয়পুর হোটেলে যেতে হয়। কারণ সেখানে যাঁদের রেখে এসেছি তাঁরা আমাদের অতিথি। তাঁরা বললেন তাঁরা হোটেলের আতিথ্যে একরকম আছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ি ভাড়ার সন্ধানে— এবার শহরের মধ্যে নয় শহরের বাইরে যদি কোনো বাসস্থান পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় বাড়ি! বাইরে কেবল চষা মাঠ, মন্দির ও বাগান। এ ছাড়া যা বাড়ি আছে তা সবই সরকারি বাড়ি। ঘুরতে ঘুরতে বেলা চড়তে লাগল। শীতকাল বলে ঘোরা সম্ভব ছিল, অন্য সময় হলে হয়তো কখন .ভিরমি খেয়ে পড়তুম, চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল তখনও স্নানাহার কিছুই হয়নি। কী করব— চতুর্দিকে অন্ধকার দেখছি, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে। একটা বাগানে গাছে নেবু ফলে আছে দেখে সকলে পরামর্শ করছি, এ-ক্ষেত্রে নেবু ছিঁড়ে খেলে চুরি করা হবে কি না, এমন সময় একজন লোক এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল।

হঠাৎ কানের কাছে ওইরকম একজন তলোয়ারধারী রাজপুতকে এসে দাঁড়াতে দেখে আমরা তো ভড়কেই গেলুম। লোকটি আমাদের দিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে— তোমরা কোথাকার লোক?

— বাংলার লোক।

— তোমাদের হিম্মৎ সিং মহারাজা ডাকছেন। জিজ্ঞাসা করা গেল কে তোমাদের হিম্মৎ সিং মহারাজা? লোকটি বলল— তিনি হচ্ছেন মহারানা ফতে সিংয়ের ভাই।

সে-সময়ে উদয়পুরের মহারানা ছিলেন ফতে সিং। এই রানা ফতে সিংয়ের কথা পিয়ারে লোটির বইতে আছে। সে-কথা সুবিধা হলে সময়ান্তরে বলব। আমরা লোকটির সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হলুম। গিয়ে দেখি একটি মন্দিরের সামনে মহারাজা হিম্মৎ সিং সপার্ষদ দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা যখন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম তখন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফেরালে নমস্কার করব। কিন্তু তা হল না। মহারাজা উলটোদিকেই মুখ ফিরিয়ে যেন হাওয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন— এঁরা কারা, কোথায় এঁদের বাড়ি এবং কী চান?

উদয়পুরে কিছুদিন থাকতে থাকতে জানতে পারলুম সেখানকার মহারানা এবং তাঁর বংশীয় বড়োলোকেরা এবং অন্যান্য সর্দারেরা মানুষের মুখের দিকে মুখ করে কথা বলেন না। যাই হোক, মহারাজের এই ব্যবহার আশ্চর্য লাগলেও আমরা বললুম— মহারাজা, আমরা বিদেশি বাঙালি এখানে এসেছি ফিল্ম তুলতে। কিন্তু কাল থেকে আশ্রয়বিহীন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

হিম্মৎ সিং মহারাজা আমাদের কথা শুনে এক মুহূর্তে কী ভেবে আকাশের দিকে মুখ চেয়ে বললেন— ইন্‌লোগ কো ওয়াস্তে মেরা বগ্‌গিখানা খোল দেও। বলেই সামনে ঘোড়া ছিল তাতে গিয়ে চড়লেন। জন কতক পারিষদও তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে নিজেদের ঘোড়ায় উঠল। তাঁরা চলে গেলেন, কোনো ভয় নেই। মহারাজা নিজে তাঁর বগ্‌গিখানা খুলে দিতে বলেছেন তোমাদের জন্যে। শহরের মধ্যে হাতিপোলের কাছে তাঁর বগ্‌গিখানা, সেখানে গিয়ে দেখো— সব ঠিক হয়ে আছে।

বাসস্থান সম্বন্ধে আমরা একরকম নিরাশই হয়েছিলুম। কীরকম আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে তা ঠিক হয়ে গেল। তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই— এই ভেবে আমরা ছুটতে ছুটতে শহরের মধ্যে গিয়ে হিম্মৎ সিং মহারাজের বগ্‌গিখানা আবিষ্কার করলুম। বগ্‌গিখানা মানে যেখানে গাড়ি থাকে, ঘোড়া থাকে না। মহারাজার অনেক গাড়ি, সেই অনুপাতে বগ্‌গিখানাও অনেক বড়ো। গিয়ে দেখি, ইতিমধ্যেই বগ্‌গিখানার দোতলা তেতলা খুলে দেওয়া হয়েছে। লোকজন ধোয়া-ধুয়ি করছে। আমরা যেতেই প্রতিবেশীরা তটস্থ হয়ে উঠল। সকলেই আমাদের সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত। সকলেই মনে করতে লাগল, আমরা বুঝি মহারাজা হিম্মৎ সিংয়ের লোক।

মাথা গোঁজবার জায়গা ঠিক হলেও তখনও অনেক কাজ বাকি। সেখানে সব কুয়োর জল আবার পান করা যায় না। সেই শহরের বাইরে থেকে মিঠা জল আনবার লোক ঠিক করতে হল। রাঁধবার লোক, মেথর, ঝি, চাকর ইত্যাদি ঠিক করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সে-দিনও বাজার থেকে যাচ্ছেতাই খাবার এনে উদরপূর্তি করা গেল। সন্ধ্যে হতে-না-হতে দলে দলে লোক দোতলায় উঠে আসতে আরম্ভ করলে। কেউ-বা প্রতিবেশী বা এই শহরেই থাকে, নতুন লোক এসেছে, বিশেষত নাটকের লোক এসেছে বলে দেখা করতে এসেছে। তাদের কাছ থেকে ছবি তোলবার সব সুলুকসন্ধান নিতে লাগলুম। কেউ বললে— এখানকার প্রাসাদের ছবি তুললে একেবারে কেটে ফেলবে। কেউ বললে— না কেটে ফেলবে না, তবে জেল হতে পারে। কেউ

বললে— কিছুই হবে না, কিন্তু প্রহার দিয়ে আধমরা করে ফেলবে। সব শুনে আমাদের চক্ষু চড়কগাছে উঠতে লাগল।

এত কথা এখানে বলবার কারণ এই যে, স্টুডিয়ো না থাকার দরুণ তখনকার দিনে দেশীয় রাজ্যে যেসকল কোম্পানির দায়ে পড়ে যেতে হতো তারা যে কীরকম বিপদ ও অসুবিধার সম্মুখীন হতেন তার একটা রেকর্ড রাখা। স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশীয় রাজ্যের দেশীয়ত্বটুকু লোপ পাওয়ায় হয়তো সে-দিন আমরা যা দেখেছিলুম এবং যেরকম অসুবিধা ভোগ করেছিলুম তা দূর হয়েছে। তবুও ইতিহাসের পাতায় আমাদের এই বিবরণ লেখা থাকুক।

উদয়পুর রাজ্যের রাজপ্রাসাদ অর্থাৎ রানা যেখানে বাস করতেন এবং এখানে-সেখানে অন্যান্য যেসব প্রাসাদ আছে তা শিল্পকলা ভাস্কর্য ও স্থপতিবিদ্যার অপূর্ব নিদর্শন। আমি অনেক দেশীয় রাজ্য ঘুরেছি কিন্তু একাধারে প্রকৃতি এবং মানুষের সৃষ্ট এমন সুন্দর জায়গা খুব কমই দেখেছি। শহরের চারিদিকেই পাহাড়, বড়ো বড়ো নদীকে বাঁধ দিয়ে বড়ো বড়ো হ্রদে পরিণত করা হয়েছে, সে যে কত বড়ো বিরাট ব্যাপার না দেখলে বিশ্বাস হয় না। রাজ্যময় পাহাড়ের ওপরে ছোটো-বড়ো দুর্গ। যদি কোনো কোম্পানি তেমন অর্থব্যয় করতে পারেন তা হলে সিসিল বি ডি'মিলোর বড়ো বড়ো ছবির থেকেও বিরাট ছবি তৈরি করতে পারেন।

কিন্তু সে-কথা থাক। আমাদের অনভিজ্ঞতার জন্য প্রথমত আমাদের যথেষ্ট ভুগতে হয়েছিল। সেখানে যে ছবি তুলতে যাব

এসব বিষয়ে সেখানকার কর্তাদের সঙ্গে আগে থাকতেই ব্যবস্থা করা আমাদের উচিত ছিল।

শুনলাম যে সেখানকার প্রাসাদ ইত্যাদির ছবি তোলা বারণ। এ-বিষয়ে মহারানার বিশেষ হুকুম আছে এবং একমাত্র তিনিই এই হুকুম রদ করতে পারেন। আমরা যে-দিনে উদয়পুর শহরে পৌঁছলুম সেই দিনই মহারানা বেরিয়েছেন। মুহূর্ত-কা-শিকারের উৎসবে। সারা শীতকাল তিনি পারিষদবর্গ নিয়ে জঙ্গলে থাকবেন এবং শিকার খেলবেন। সে এক বিরাট ব্যাপার। আমরা তার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করেছি। পাঠকের মনে থাকতে পারে এই মুহূর্ত-কা-শিকারের উৎসবেই রানা প্রতাপ সিংহ ও তাঁর ভাই শক্ত সিংহের ঝগড়া হয়েছিল, কিন্তু সে-ঝগড়ার কথা থাক, তা তো ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে গেছে, কিন্তু আমরা রানার হুকুমের জন্য এই তিন মাস কোন ভরসায় এত লোক নিয়ে শহরে বসে থাকি? মাত্র এক মাসের কড়ার করে আমরা এসেছিলুম। খোঁজ করে জানা গেল মহারাজ কুমার অর্থাৎ ভবিষ্যতে যিনি রানার গদিতে বসবেন তিনি ইচ্ছা করলে এ-বিষয়ে মত দিতে পারেন। এদিকে আমরা পোশাক তৈরি করবার ব্যবস্থা করে রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করবার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম। অনেক চেষ্টার পর স্থির হল যে রাজপুত্র এবং তাঁর পারিষদবর্গ আগে আমাদের গল্পটা আগাগোড়া শুনবেন, তারপর যা হয় হবে।

একদিন সন্ধ্যা বেলা আমরা কজনে মিলে গল্প শোনাতে গেলুম। একটি ছোটো পাহাড়ের ওপরে সুন্দর একখানি বাড়িতে রাজপুত্র বাস করেন। শহরের বাইরে। সেখানে পৌঁছে দেখলুম

কর্মচারীরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের দেখে তাঁরা বললেন— আপনারা এ কী পোশাকে এসেছেন? আমাদের মধ্যে তিনজনের অঙ্গে পেন্টুলান-কোট ছিল ও অপর জনের অঙ্গে ধুতি-পাঞ্জাবি ও শাল ছিল। তাদের বলবার তাৎপর্য যা বুঝতে পারলুম, তাতে রাজপুত-পোশাক পরে এলেই ভালো হতো। কিন্তু তখন তো আর কোনো উপায় নেই। বললুম কী পোশাক পরে এলে ভালো হবে— আপনারা আজ্ঞা করুন। আজকে আমরা নাহয় ফিরেই যাচ্ছি।

কর্মচারীরা আমাদের অপেক্ষা করতে বলে নিজেদের মধ্যে খানিকক্ষণ পরামর্শ করে ফিরে এসে বললেন, যে-ঘরে যুবরাজের সঙ্গে দেখা হবে সেখানে আপনারা জুতো পায়ে দিয়ে ঢুকতে পারবেন না। কিন্তু মোজা পায়ে থাকা চাই, কারণ 'এঁড়ি' গোড়ালি বার করে তাঁর সামনে দাঁড়ানো চলবে না। দাঁড়ানো এইজন্যে বলছি যে যুবরাজের সামনে আমাদের বসবার প্রশ্ন নাকি উঠতেই পারে না। এ তো গেল পায়ের দিক। খালি মাথায়ও সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য, এই দুই প্রথাই মোগল রাজদরবারে প্রচলিত ছিল।

এদিকে আমরা ভালো সুট পরে খালি মাথায় কোঁকড়ানো চুলে যথাসাধ্য মোমবাতি আর্গ মলম লাগিয়ে ব্রাশব্যাক করে গিয়েছি, সেখানে গিয়ে মাথা ঢাকতে হবে, কী দুর্দৈব। কিন্তু মাথা ঢাকি কী দিয়ে। আমাদের কাছে তো টুপি নেই। অনেক বাদানুবাদ ও তর্কাতর্কির পর ঠিক হল যে, রুমাল দিয়ে মাথা ঢেকে যাওয়া হবে কিন্তু মুশকিল বাধল যে-ব্যক্তি ধুতি পরে আছে তাকে নিয়ে,

'ধুতিবন্ধ'কে যুবরাজের সামনে যেতে দেওয়া কিছুতেই হতে পারে না। ফলে 'ধুতিবন্ধ' মাথায় ও পায়ে শালমুড়ি দিয়ে সেই শীতে পাহাড়ের একধারে বসে জ্যোৎস্না উপভোগ করতে বাধ্য হল। পেন্টুলানধারীরা মাথায় রুমাল বেঁধে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

কর্মচারীরা আমাদের একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। মাঝারি গোছের ঘর। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে রাজোচিত কিছুই দেখতে পেলাম না। বোম্বাইয়ের যেকোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকের বসবার ঘরে তার চেয়েও ভালো আসবাবপত্র থাকে। যাহোক, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর কোণের একটা দরজা দিয়ে যুবরাজ প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করলেন বলা ভুল হবে, তাঁকে টেনে নিয়ে আসা হল। যুবরাজের অর্ধাঙ্গ অর্থাৎ কোমর থেকে মাথা অবধি বেশ পরিপুষ্ট কিন্তু কোমর থেকে পা পর্যন্ত অপরিপুষ্ট। পাদুটো কাঠির মতো সরু। নড়তে-চড়তে পারেন না, কোথাও যেতে আসতে হলে লোকে তাঁকে এইরকম টেনে নিয়ে যায়।

যুবরাজকে তো নিয়ে এসে সভায় বসানো হল। আমরা ঘাড় প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে তাঁকে নমস্কার করলুম। কিন্তু নমস্কারের কোনো প্রতিনমস্কার তিনি তো করলেনই না, পরন্তু এমনভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন যাতে মনে হল আমরা তাঁর নজরেই পড়িনি। এ-কথা হয়তো আগেই বলেছি যে, মহারানা যুবরাজ অথবা রানার কোনো নিকট আত্মীয় মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না এবং একমাত্র ভগবান ছাড়া কারুকেই হাত তুলে নমস্কার করেন না।

যাহোক, বাক্যব্যয় না করে গল্পটি বলতে আরম্ভ করা গেল। বলা বাহুল্য, গল্পটা ইংরেজিতে বলা হচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে যুবরাজ তাঁদের দেশীয় ভাষায় কর্মচারীদের কী বলতে লাগলেন, তা আমাদের একবর্ণও বোধগম্য হল না। গল্প বলা শেষ হয়ে গেলে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হল— গল্পটি লিখেছে কে?

এই প্রশ্নের মধ্যে এমন উষ্মা প্রকাশ পেল যে আমাদের মনে হল গল্পটি তাঁদের পছন্দ তো হয়নি, উলটে গল্পলেখককে পেলে মজা দেখিয়ে দেবে।

আগেই বলেছি গল্পটির লেখক আমিই। কাজেই আত্মরক্ষার দায়ে বলতে হল— হুজুর গল্পলেখক কলকাতায় বাস করেন। তিনি আমাদের সঙ্গে আসেননি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যুবরাজ বেশ রাগান্বিত স্বরে বললেন— তোমাদের দেশে বুঝি উদয়পুর রাজ্য সম্বন্ধে এই ধরনের সব গল্প লেখা হয়?

কথাটা শুনে আমরা হকচকিয়ে গেলুম। আমাদের গল্পের মধ্যে কোনো জায়গায় উদয়পুর রাজ্য সম্বন্ধে অসম্মানকর কিছু বলা কিংবা করা হয়নি। আমরা বললুম— হুজুর আমাদের দেশের প্রত্যেক লোক উদয়পুর রাজ্যের নামে মাথা হেঁট করে সম্মান জানায়। আমাদের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম সাহিত্যিক অবধি আপনাদের রাজ্য সম্বন্ধে কোনো অসম্মানকর কথা বলেননি। আমরা গানে এবং নাটকে উদয়পুর রাজ্যকে বরাবর খুব বড়ো করেই দেখিয়ে থাকি। বর্তমান এই গল্পের কোন জায়গায় উদয়পুর রাজ্যের প্রতি

অসম্মানকর ইঙ্গিত আছে, তা জানতে পারলে আমরা এখুনি তা বদলে দেব।

আমাদের লেকচার শুনে যুবরাজ বোধ হয় একটু নরম হলেন। অবশ্য সেটা তাঁর কথার সুরে প্রকাশ পেল, কার্যে নয়। কার্যত তিনি বললেন— কোনো রাজপ্রাসাদের ভেতরকার কোনো ছবি নেওয়া এ-রাজ্যে নিষিদ্ধ আছে।

এই ছবি তোলা সম্বন্ধে নিষেধ নিয়মের একটা কথা প্রকাশ করা এখানে প্রয়োজন বোধ করি। এখানে এসে অবধি বুঝতে পারছি, ছবি তোলা সম্বন্ধে সাধারণের মন অনুকূল নয়। ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আধুনিক দু-চারজনকে বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, ছবি তোলাতে সেখানকার কেউই রাজি নয়, কারণ তারা মনে করে ছবি তোলালেই নাকি পরমায়ু ক্ষয় হবে। অবশ্য প্রতিকৃতি হাতে আঁকাতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ক্যামেরা দেখলেই সর্বনাশ। সিনেমাক্যামেরার তো কথাই নেই। প্রাসাদে এবং শহরের কোন কোন জায়গায় ছবি তোলা যেতে পারে, আমরা তার একটা তালিকা তৈরি করে রেখেছিলুম। হাতিপোল বলে প্রাসাদের একটা বড়ো গেট আছে। সেখান দিয়ে হাওদাওয়ালা হাতিসুদ্ধ চলাফেরা করা যেতে পারে। আমরা ভেবে রেখেছিলুম ওইখান দিয়ে আমাদের ছবির রানা মহাশয় হাতি চড়ে চলে আসবেন। লিস্টের মধ্যে এইটি দেখেই কুমার বাহাদুর তো চটেই আগুন। তিনি বললেন— তোমাদের আস্পর্ধা তো কম নয়। এই রানার দেশে রানা সেজে রানার প্রাসাদ থেকে হাতি চড়ে বেরিয়ে

আসার কল্পনা করেছ? আমরা তা করবার হুকুম দিলেও রাজ্যের লোকেরা ইট মেরে সেই রানাকে হাওদাচ্যুত করে রাস্তায় ফেলে তলোয়ার দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে ফেলবে।

যুবরাজের কথা শুনে আমার বন্ধুদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বলতে পারি না, তবে আমার তো হৃৎকম্প উপস্থিত হল। কারণ আমার রানার ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল। কোনো ছুতোয় সেখান থেকে সরে পড়ব কি না ভাবছি, এমন সময় যুবরাজ জিজ্ঞেস করে ফেললেন— তোমাদের মধ্যে কে রানার ভূমিকায় অভিনয় করবে? অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই আমি বলে ফেললুম— আজ্ঞে সে এখন কলকাতায় আছে, এখান থেকে খবর পাঠালেই আসবে।

বোধ হয় সে-ব্যক্তিকে হাতের কাছে না পেয়ে যুবরাজ আরও বেশি চটে গিয়ে বললেন— এখানে তোমাদের বিশেষ কিছু সুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না। অন্যত্র ব্যবস্থা দেখো।

যুবরাজের কথা শুনে আমাদের মনের কী অবস্থা হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। ভাবলুম, তবে কি এত কষ্ট করে এখানে আসা বৃথাই হবে? একবার শেষ চেষ্টা করে তাঁকে বললুম— হুজুর, একবার বিবেচনা করুন আমরা কত আশা করে আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি, লোকজন জিনিসপত্র অভিনেতা-অভিনেত্রী সব সঙ্গে নিয়ে এসেছি, সবই কি বৃথা যাবে?

এতক্ষণে আমাদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে তাঁদের কাঠিন্য কিছু তরল হল বলে মনে হল। যুবরাজ হুকুম দিলেন— আচ্ছা, আপাতত তোমরা বাইরে বাগানে ও অন্যান্য জায়গায় ছবি তুলে

কোনো প্রাসাদের ছবি তুলতে হলে আবার আমাকে জানিয়ো, যা ব্যবস্থা হয় পরে তোমাদের জানানো যাবে।

আমরা প্রতিদিনই ছবি তুলতে লাগলুম এবং প্রতিদিনই সন্ধ্যে বেলা যুবরাজের কাছ থেকে লোক এসে কোথায় ছবি তোলা হয়েছে তার বিবরণ নিয়ে যেতে লাগল। দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কাঠিন্যও কিছু শিথিল হয়ে আসতে লাগল এবং কোনো কোনো প্রাসাদেরও মধ্যেকার ছবি তোলবার হুকুমও আমরা পেতে লাগলুম। মেয়েদের গয়না নিয়ে বড়োই মুশকিলে পড়া গেল। নকল গয়না সেখানে পাওয়া যায় না। নকল গয়নার খোঁজ করতে গেলে সেখানকার লোকে বলে আমাদের এ-রামরাজ্যে নকল জিনিসের কারবার নেই। নকল গয়না খোঁজা তোমরা বন্ধ করো, নইলে পুলিশের খপ্পরে পড়ে যাবে। আমাদের বাড়ির কাছেই এক মুদির দোকান ছিল, সে বোরি মুসলমান। অবশেষে সে বললে— নকলের দরকার কী? আমি তোমাদের আসল গয়নাই এনে দেব। প্রতিদিন একটা অসম্ভব রকমের ভাড়া নিয়ে সে আমাদের পুরোনো দিনের গহনা (আসল) জোগাতে লাগল।

এ ছাড়া আরেক বিষয় নিয়ে আমাদের সেখানে খুবই মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। আগেই বলেছি, সেখানকার লোকেরা ফোটো তোলাতে নারাজ কিন্তু সুপার ছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণ করা অসম্ভব। মনে করুন, রানা কিংবা রাজকুমার কোথাও যাচ্ছেন। তাঁরা আমাদের মতো ছাতি মাথায় দিয়ে রাস্তায় ট্যাং ট্যাং করে তো হেঁটে যেতে পারেন না, তাঁর জন্য ছত্রধারী চাই, আশেপাশে দু-চারজন কর্মচারী বা পারিষদ ইত্যাদি চাই। এখন এখান থেকে

উদয়পুরে রানাকেই নিয়ে যাওয়া চলে, আশেপাশের লোক অর্থাৎ যাঁরা বাক্যব্যয় করবেন না সেরকম লোককে সেখান থেকেই বন্দোবস্ত করা হবে, সেরকম ঠিক ছিল। কিন্তু কাজের সময়ে দেখা গেল বাংলা দেশের মতো অভিনেতার ভিড় সেখানে নেই। পয়সা দিয়ে ডাকলেও লোকে সেখানে সিনেমায় মূক-অভিনয় করতেও রাজি হতো না। পুরুষদের বেলায় যখন এই ব্যাপার, মেয়েদের বেলায় কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। আমরা স্থির করেছিলুম, ছবিতে একটা নাচের দৃশ্য দেওয়া হবে। উদয়পুরে অতগুলি মেয়ে নাচিয়ে পাওয়া অসম্ভব স্থির করে আমরা আজমির থেকে কতকগুলি মেয়ে নিয়ে এসে সেই দৃশ্য তুলব ঠিক করলুম। সেখানকার মেয়েও প্রায় জোগাড় হয়েছিল, এমন সময় যুবরাজের প্রাসাদ থেকে আমাদের ডাক পড়ল। এবার মাথা ও পা দুই প্রান্তই আবৃত করে যুবরাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। এবার যুবরাজকে দেখে বেশ খুশিই মনে হল। তিনি প্রথমে বললেন— কই, তোমরা ছবিটবি তুলছ, একদিন কীরকম করে ছবি তোল আমাদের দেখালে না?

বললুম— হুজুর যবে দেখতে চান, দয়া করে আমাদের জানালেই আমরা সে-দিন বন্দোবস্ত করব। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন— আমি শুনলুম তোমরা আজমির থেকে নাকি নাচিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করছ?

যুবরাজের প্রশ্ন শুনে আমরা প্রথমে কী যে জবাব দেব তা ভেবেই ঠিক করতে পারি না। এই আজমির থেকে মেয়ে আনানোর চেষ্টাটা অতি সংগোপনেই চলছিল। আমাদের দলের

অনেকেই সে-কথা জানত না। কিন্তু সে-সংবাদটি একেবারে যুবরাজের কানে গিয়ে উঠল কী করে তা আমরা ভেবেই ঠিক করতে পারলুম না। অবিশ্যি এর মধ্যে অন্যায় কিছু ছিল না বরং উদয়পুর রাজ্য অথবা স্টেট থেকে এ পর্যন্ত আমাদের কোনোরকম সাহায্যই দেওয়া হয়নি। আমরা যুবরাজকে বললুম— এখানে চেষ্টা করে আমরা একজন পুরুষও পাইনি, মেয়ে কোথায় পাব বলুন! যুবরাজ বললেন— আমাদের এখানে অনেক নাচিয়ে মেয়ে আছে, তারা পুরুষানুক্রমে স্টেট থেকে পেনসন পেয়ে আসছে, তাদের নিতে পারো। যুবরাজের এই কথা আমরা তাঁর আদেশস্বরূপ মেনে নিতে বাধ্য হলুম। কোথায় তাদের পাওয়া যাবে, এসব ঠিক করা সম্বন্ধে তাঁর এক কর্মচারীকে তিনিই নিযুক্ত করে দিলেন।

বাইরে থেকে মেয়ে নিয়ে এসে কাজ করাতে যুবরাজের আপত্তির কারণ পরে জানতে পেরেছিলুম। বাইরের কোনো লোক স্টেটের ভেতর থেকে পয়সা নিয়ে চলে যাবে এটা সেখানকার রাজা প্রজা কেউই সহ্য করতে পারে না। অথচ সেখানকার লোকেরা যে কোনো কাজেরই নন, অর্থাৎ আমাদের কোনো কাজেই লাগেন না, সে-কথা তাঁরা স্বীকার করতে চান না। যাহোক, স্টেট থেকে নাচিয়ে পাওয়া যাবে জেনে আনন্দে বাড়িতে ফিরে আসা গেল। এবং তৎক্ষণাৎ আজমিরে টেলি করে মেয়েদের আসতে নিষেধ করে দেওয়া গেল।

এই প্রসঙ্গে সেখানকার গুপ্তচরদের কথা কিছু উল্লেখ করছি। সেখানে স্টেটের প্রায় প্রত্যেক লোকেই অকারণ পুলকে গুপ্তচরের

কাজ করে থাকে। আমরা সকাল বেলায় ক-আনার জিলিপি খাই, দুপুরে কী খাই, প্রতিদিন কত মাংস ও ঘি আসে সব সংবাদই প্রাসাদের উচ্চকর্মচারীরা জানতেন। যুবরাজ জানতেন কি না বলতে পারি না। এই সঙ্গে আরেকটি কথাও মনে পড়ছে, একদিন যুবরাজ আমাদের ডেকে বললেন— তোমাদের লোক এজেন্টের বাড়িতে যাতায়াত করে কেন?

প্রশ্ন শুনে আমরা তো আকাশ থেকে পড়লুম। প্রথমত আমরা সকলেই ছিলুম অতি নগণ্য ব্যক্তি। এজেন্টের বাড়ি অবধি পৌঁছোবার মতো কেউ আমাদের মধ্যে ছিল না। কাজেই যুবরাজকে বললুম— হুজুর, বোধ হয় ভুল শুনেছেন। এজেন্টের ওখানে যাবার মতো কোনো লোক আমাদের মধ্যে নেই, তবুও আমরা এ-বিষয়ে তদারক করে আপনাকে জানাব।

আমাদের কথা শুনে শ্লেষের হাসি হেসে তিনি বললেন— আমার রাজত্বের কেউ আমার কাছে কোনো ভুল খবর দেবে না। তোমরা খবর নিয়ে আমাকে শীঘ্র জানাবে সে কী করতে সেখানে গিয়েছিল।

আমরা চলে আসবার সময় তিনি ডেকে আবার বললেন — দেখো, আবার যদি শুনি তোমাদের কেউ এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, তা হলে সেই দিনই এই রাজ্য ত্যাগ করতে হবে মনে রেখো।

আমরা বাড়িতে ফিরে এসে খবর নিয়ে জানলুম আমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যায়নি। শেষকালে জানতে পারলুম, যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদুটি আমাদের সঙ্গে এসেছে তাদের

একজনের বাবা এজেন্টকে সেলাম করতে গিয়েছিলেন, কোনো বিশেষ প্রয়োজনে নয়, এমনিই। যাহোক, আমরা তখুনি যুবরাজকে জানালুম, একজন সাদা চামড়া অপর সাদা চামড়াকে সেলামবাজি করতে গিয়েছিল মাত্র, আর কোনো মতলব তার ছিল না।

আমাদের একটি ছোটো ছেলের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু যেখানে বুড়োই পাওয়া যায় না সেখানে ছোটো ছেলে জুটবে কী করে? আমরা যখন বাইরে থেকে আবার ছোটো ছেলে আনবার চেষ্টা করছি, সেই সময় আমাদের মাল সরবরাহ্ করত যে বোরি মুসলমান সে বললে— আমি একটি ছেলে তোমাদের দিতে পারি, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা খুবই গোপনে রাখতে হবে। ছোটো ছেলেটি আর কেউ নয়, আমার নাতি। আমার মা যদি টের পায় তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। আমরা তখন কোনো রকমে উদয়পুরের কাজ শেষ করে সরে পড়তে পারলে বাঁচি। বোরিকে আশ্বাস দেওয়া গেল, খুব গোপনেই কর্মসমাধা হবে।

উদয়পুর রাজ্যের পিছোলা হ্রদের ওপরেই একটি সুন্দর রাজকীয় উদ্যানবাটিকা আছে। সেখানে ঠিক হ্রদের ওপরে একটি পাথরের হস্তীমূর্তি বসানো আছে। এই বাড়িকে হাতি প্যালেস বলা হয়। রাজবাড়ির ঘাট থেকে নৌকায় চড়ে সেইখানে পৌঁছোতে হয়। রাজ্যের তরফ থেকে সে-দিন আমাদের সুন্দর একটি বজরা দেওয়া হয়েছিল। সেই বজরায় চড়ে আমরা সেই ছেলেটিকে নিয়ে গোপনে হাতি প্যালেসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম। বলা বাহুল্য, শিশুটির পিতামহ অর্থাৎ আমাদের সেই বোরি মুসলমান সঙ্গেই ছিল। শুটিং আরম্ভ হবে— ছেলেটি এবং অন্যান্য অভিনেতাকে

সাজিয়েগুছিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করানো হয়েছে, নীতিন ক্যামেরার কাজ করছে, সব ঠিকই আছে কেবল একটুখানি রোদের অপেক্ষায় আমরা বসে আছি। শুটিং দেখতে ভিড় জমেছে কম নয়, এমন সময় জলের ধারে একটা হইহই শব্দ শুনে আমরা চমকে সে-দিকে তাকিয়ে দেখি, এক অশীতিপর বৃদ্ধা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ও সেইসঙ্গে কপালে করাঘাত করতে করতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। বৃদ্ধা কী বলছিল, তার ভাষা আমরা বুঝতে না পারলেও যে বুঝতে পারবার সে বুঝতে পেরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে-বৃদ্ধা আর কেউ নয়, আমাদের সেই বোরির মা। বৃদ্ধা আর্তনাদ করতে করতে ছুটে এসে ছেলেকে, যার বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্নর কম নয়— তিন-চার চড় ঠেসে বসিয়ে দিলে। তারপরেই ছুটে গিয়ে তার প্রপৌত্রের একখানা হাত ধরে টেনে তুললে। আশ্চর্যের বিষয়, সেই ছেলেটির মাথায় লম্বা লম্বা চুলের পরচুলা পরানো হয়েছিল, তা ছাড়া রাজপুত্রের পোশাকে তাকে সাজানো হয়েছিল— এসব সত্ত্বেও বৃদ্ধার তাকে চিনতে এক মুহূর্তও দেরি হল না। এক হেঁচকা টানে তাকে তুলে নিয়ে এসে বৃদ্ধা প্রথমেই তাকে তিন-চার চড় জমিয়ে দিলে। তারপর নীতিনের দিকে মারমুখো হয়ে দৌড়োল। নীতিন তো পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলে। বৃদ্ধা তখন প্রপৌত্রকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে নৌকায় চড়ে চলে গেল। আমরা সবাই হতবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। রোদ উঠল বটে, কিন্তু সে-দিন আর শুটিং হল না।

একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে, কাল আমাদের সেই নাচের সিনটা দেওয়া হবে। তখুনি রাজদপ্তরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলুম

যে, আগামীকাল বেলা দশটার সময় সেই আগের বর্ণিত হাতি প্যালেসে নাচিয়েদের পাঠানো হবে। আমরা যেন ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে সময়মতো প্রস্তুত হয়ে থাকি। রাজসরকার থেকেই আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হবে।

যথাসময়ে আমরা হাতি প্যালেসে গিয়ে উপস্থিত হলুম। কিছুক্ষণ পরে একটা নৌকা করে কতকগুলি লোক এল, তাদের সঙ্গে অনেকগুলি বিরাট বিরাট লহেঙ্গা (ঘাগরা), যার ঘের হবে এক কাঠা জমি জুড়ে। অনেকগুলি লাঠি, লাঠি মানে লগুড় নয়, যেরকম লাঠি আমাদের দেশে মেলায় বিক্রি হয়— ছোটো ছোটো কাঠের দণ্ড নানারকম রং করা, তা ছাড়া বিচিত্র রংবেরঙের ওড়না। ওড়নার মধ্যে আবার কোনো-কোনোগুলিতে চকচকে জরির কাজও দেখা গেল।

নাচের সরঞ্জাম দেখে আমরা যেমন খুশি হয়েছিলুম, নাচিয়েদের দেখে তেমনি দমে গেলুম, একটু বাদে স্টেটের বজরায় চড়ে একদল নারী এসে হাজির হল। এতদিন ধরে উদয়পুরের পথেঘাটে যে হাজার হাজার মেয়ে দেখেছিলুম তাতে মনে হয়েছিল যে, সেখানকার মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়েও সাধারণত দেখতে ভালোই। তাদের দেহসৌষ্ঠব যে আমাদের মেয়ের চেয়েও অনেক বেশি সুষম, সে-কথা সেখানে যিনিই গিয়েছেন তাঁকেই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তারপরে যখন রাজনর্তকীর দল এসে পৌঁছোল তখন তাদের দেখে মনে হল, ধরণী দ্বিধা হও। তাদের বয়স যে কত হয়েছে তা অনুমান করতে হলে প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন হয়। শুধু তা-ই

নয়, তাদের প্রত্যেকেই কুশ্রীতার জন্য পুরস্কার পেতে পারে। এরা যে কী করে রাজবাড়ি থেকে পেনসন পায় তা আমরা ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। কিন্তু যুবরাজ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে তারা, তাদের ছবি না নিয়ে বিদায় করে দিলে সেই দিনই আমাদের উদয়পুরের বাস তুলতে হবে। যাহোক, আমরা তৈরি হতে লাগলাম, ওদিকে তারাও ঘাগরা ও ওড়না চড়িয়ে যখন তৈরি তখন আমাদের নীতিনবাবু বললেন যে, ওদের মুখে একটু পাউডার মাখিয়ে চোখগুলোর নীচে একটু রংটং লাগিয়ে না দিলে ছবি যে উঠবে না। কিন্তু তাদের কাছে এ-কথা প্রস্তাব করা মাত্র তারা সকলে একবাক্যে আপত্তি জানালে। তারা বললে, তারা নটিনীর পেশা করে না। একেই তো ফোটো তোলাতে হবে বলে আগে থাকতে তারা বিরূপ হয়েছিল, তারপরে এই মেক-আপ করার কথা শুনে একেবারে বিগড়ে দাঁড়াল। অনেক সাধ্যসাধনার পর তারা শেষকালে মেক-আপ না করে নাচতে রাজি হল।

নাচ শুরু হল। একসঙ্গে দশ-বারোটি মেয়ে বাজনার সঙ্গে তালে তালে গোল হয়ে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করলে। নর্তকীদের চেহারা ও বয়স দেখে যেরকম দমে গিয়েছিলুম নাচ দেখে তেমনি মুগ্ধ হলুম। অপূর্ব ছন্দে এবং সুষমায় একসঙ্গে সেই বিরাট রঙিন লহেঙ্গা ঘুরিয়ে এবং লাঠিতে লাঠি মেরে সে-নাচ— তুলনাহীন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছবিতে তার শতাংশের একাংশও বোঝানো যাবে না। তাদের নিয়ে বেশ কিছুকাল ধরে ছবি তোলার জন্য বিশদভাবে যদি তৈরি করা যায় তবে হয়তো ভালো ছবি হতে পারে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তার সুযোগ কোথায়? তার ওপর সূর্যের

আলো ঠিক রকমে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারায় ছবিও মনের মতো করে তুলতে পারা গেল না।

উদয়পুরের আরেকটি মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমাদের গল্পের মধ্যে ছিল— একটি মেয়েকে প্রাসাদের মধ্যে একরকম নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিল। সেই মেয়েটি রানার একমাত্র ছেলেকে ভালোবাসত। কিন্তু তাদের মিলন হওয়া অসম্ভব ছিল। একদিন যুবরাজ শিকার করতে গিয়ে দৈববশত হিংস্র জন্তু কর্তৃক নিহত হন। এই সংবাদ পেয়ে মেয়েটি রাত্রি বেলা রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে প্রাসাদের পেছনে পিছোলা হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই দৃশ্যটি অবিশ্যি আত্মহত্যা করা বাদে শুধু প্রাসাদ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটুকু নেওয়া হয়েছিল। রাস্তার ও প্রাসাদের অনেক লোকই দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি উপভোগ করছিল— যেমন অন্যান্য দিনও করত। সে-দিন কাজকর্ম সেরে বাড়িতে এসে বসতে-না-বসতে আমাদের সেই বোরি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে— আজ তোমরা প্রাসাদে কী ছবি তুলেছ? বোরিকে বুঝিয়ে বললুম, সে বললে— শহরময় হইহই পড়ে গিয়েছে, তোমরা নাকি প্রাসাদ থেকে কোনো রানিকে বার করে নিয়ে যাবার ছবি তুলেছ?

কী সর্বনাশ— বলে কী? আমরা বললুম— না, এরকম কাজ তো আমরা কখনও করিনি। বোরি বললে, কিন্তু শহরের চারদিকে এইরকমই রটে গিয়েছে।

বোরি তো চলে গেল। কিন্তু সন্ধ্যা হতে-না-হতেই যুবরাজের প্রাসাদ থেকে এত্তেলা এল— আজ যে-ছবি তোলা হয়েছে

সেই ফিল্ম নিয়ে অবিলম্বে যুবরাজের প্রাসাদে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।

আগেই বলেছি, আমরা প্রতিদিনকার তোলা ফিল্ম সেইখানেই ডেভেলপ করে রাখতুম। সে-দিনকার ফিল্ম ডার্করুম থেকে তখনও বেরোয়নি। সেখান থেকে বের করে সেগুলোকে ড্রামে চড়িয়ে শুকোনো— সে প্রায় ঘণ্টা দুইয়ের ব্যাপার। আমরা কর্মচারীকে সে-কথা জানাতে সে আবার ঘোড়া করে ছুটল যুবরাজের প্রাসাদে এবং কিছুক্ষণ বাদেই সেখান থেকে ফিরে এসে বললে— যত রাত্তিরই হোক, তোমরা ফিল্ম নিয়ে যুবরাজের প্রাসাদে উপস্থিত হবে।

যথা আজ্ঞা বলে কর্মচারীটাকে তখনকার মতো বিদায় দেওয়া গেল। তারপরে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটার সময় সেই আধা-শুকনো ফিল্ম নিয়ে আমরা শহর থেকে যুবরাজের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলুম। একেই সেখানকার লোকে রাত্রে প্রায় পথে বেরোয় না, রাত্রে বেরুতে হলে সেখানকার নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকের কাছে একটা করে হ্যারিকেন লণ্ঠন না থাকলে পুলিশে উৎপাত করে। তারপরে শহর থেকে বেরুবার সময় শহরের দরজা খোলানো এবং ফিরে আসার সময় দরজা খোলা পাবার ব্যবস্থার হাঙ্গামা দুই-ই আছে। পৌষ মাসের শীতের রাত্রি, আর সেই উদয়পুরের শীত মাথায় করে আমরা যুবরাজের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তাঁরা সকলেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন— ফিল্ম এনেছ? ফিল্মখানা নিয়ে তাঁরা এমনিতেই আলোর সামনে ধরে দেখতে লাগলেন কিন্তু সেই

নেগেটিভ ফিল্ম দেখে তাঁরা কী বুঝলেন জানি না, আমাদের বললেন— কই, ফোটোগ্রাফি তো ভালো হয়নি?

যুবরাজ বললেন— কাল বেলা দশটার পর ফিল্মটা নিয়ে আরেক বার এখানে এসো।

আমরা স্থির করলুম, অবিলম্বে এখান থেকে না সরে পড়তে পারলে কোনোদিন ক্যামেরা-ট্যামেরা সব বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

উদয়পুর ও জয়পুরে আমরা যে-ছবি তুলেছিলুম তার নাম রাখা হয়েছিল বাংলা— 'পুনর্জন্ম' ও ইংরেজি 'Incarnation'। ছবিখানা অ্যালবিয়ন-এ দেখানো হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সে-সময়ে ভারতে তৈরি ছবির কোনো কদরই ও-পাড়ায় ছিল না। এ-পাড়ার কোনো ছবিঘরে দেখালে হয়তো ভালোই চলত। মফস্‌সলে কীরকম চলেছিল বলতে পারি না।

আমাদের এই ছবি তোলার পর হিমাংশু রায় দু-বার ভারতবর্ষে এসে দুখানি ছবি তুলেছিলেন। একখানি ছবির নাম 'দ থ্রো অব আ ডাইস'। সেই ছবিতে চিত্রপরিচালক শ্রীচারু রায় অভিনয় করেছিলেন। ছবির নায়িকা ছিলেন শ্রীমতী এণাক্ষী রমা রাও— পরে যিনি বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রপরিচালক শ্রীযুক্ত ভাওনানির সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অন্য ছবিখানির নাম 'কর্মা'। শ্রীমতী দেবিকারাণী সে-ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং নায়কের ভূমিকায় ছিলেন হিমাংশু রায় নিজে।

'দ থ্রো অব আ ডাইস' ছবি শেষ করে চলে যাবার সময় হিমাংশুবাবু তাঁদের সাজপোশাক, ক্যামেরা প্রভৃতি বিক্রি করে দিয়ে চলে যান। এইসব জিনিস লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি

স্যার মতিসাগরের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রেমসাগর কিনেছিলেন। তাঁর পরে আরও কয়েকজনে মিলে লাহোরে একটি কোম্পানি খুলেছিলেন। এই কোম্পানি 'দ লাভস অব আ মুঘল প্রিন্স' নাম দিয়ে একখানি চিত্র নির্মাণ করেন। শ্রীযুক্ত চারু রায় ও প্রফুল্ল রায় এই দুজনে মিলে ছবিখানির পরিচালনা করেন। তাঁদের সমকর্মীরূপে আমিও এই কোম্পানিতে যোগদান করেছিলুম। 'দ লাভস অব আ মুঘল প্রিন্স' ইতিহাসবিখ্যাত আনারকলির জীবন নিয়ে রচিত। আনারকলি ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। পারস্য দেশের কোনো এক বণিকের কন্যা ছিলেন তিনি। ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে ভারতের সম্রাট আকবর বাদশার হারেমে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আকবর বাদশার পুত্র সেলিমের সঙ্গে তাঁর ভালোবাসা জন্মে। কিন্তু বাদশা তাঁদের মিলনের বিরোধী ছিলেন। রাজপুত্রের প্রতি অনুরাগিণী হওয়ার ফলে বাদশা তাঁকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেছিলেন। এই কাহিনি যেমন বিচিত্র তেমনি করুণ ও মর্মস্পর্শী। লাহোরে এখনও আনারকলির সমাধি আছে। চিত্রকাহিনি রচনা করেছিলেন হাকিম আহমদ সুজা। পাঞ্জাবে এর পরেও সবাক যুগে আমি ছবি তুলেছি এবং আমার সে-দেশ সম্বন্ধে যা অভিজ্ঞতা তাতে মনে হয়, পাঞ্জাব ছবি তোলার পক্ষে খুবই উপযোগী স্থান। সেখানকার শতকরা পঞ্চাশ জন লোক কবি। শতকরা আশি জন শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত লোকে গল্প লিখতে পারে। তা ছাড়া বোধ হয় সকলেই অভিনয় করতে পারে। প্রমাণস্বরূপ ভারতবর্ষের হলিউড বোম্বাই শহর পাঞ্জাবি অভিনেতা ও অভিনেত্রীতে পরিপূর্ণ। সংগীতেও যে তারা

কিছু কম নয়, তার আমরা অনেক প্রমাণ পেয়েছি। একটি কথা আগেকার দিনে শুনতে পাওয়া যেত যে, অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়ে দিনের বেলা এবং অত্যন্ত শীতের সময় রাত্রি বেলা সেখানে শুটিং করা অসম্ভব। কিন্তু সে-কথা ঠিক নয়। দারুণ গ্রীষ্মে আমি বাহ্ওয়ালপুরের মরুভূমিতে পাঁচ-ছ দিন উপরি উপরি শুটিং করেছি। আরও স্টুডিয়ো থাকলে রাত্রে শুটিং করার প্রয়োজন হয় না। আমার বিশ্বাস অতিরিক্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির ছড়াছড়ি যেখানে, সেখানে একত্রে সকলে মিলে কাজ করা সম্ভব হয় না বলেই পাঞ্জাবে এতদিন কোনো চিত্রশিল্পের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারেনি। 'দ লাভস অব আ মুঘল প্রিন্স'-এ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সোহন সিং নামে সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত একটি শিখ যুবক। সে-সময়ে শোনা গিয়েছিল এবং সোহন সিংও আমাদের বলত যে, সে হলিউডের কোনো কোনো ছবিতে কাজ করেছে। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বনামধন্যা সীতা দেবী। মালিকরা অর্থ ব্যয় করেছিলেন প্রচুর এবং তখনকার দিনের পক্ষে ছবি খুব ভালোই হয়েছিল, কিন্তু আগে বলেছি, অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির সমাবেশ যেখানে, সেখানে অনর্থ অনিবার্য। এই কোম্পানির মালিকদের বন্ধুবান্ধবেরা চারিদিকে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন যে, এ-ছবিতে সম্রাট আকবরকে অত্যন্ত হীন করে দেখানো হয়েছে। কথাটা গড়াতে গড়াতে শেষকালে কর্তৃপক্ষের কান অবধি পৌঁছোল। একদিন তাঁরা ছবি দেখতে চাইলেন এবং এ-ছবি দেখানো চলতে পারে না বলে রায় দিলেন। ব্যাস, ছবির দফা গয়া।

এরই কিছুদিন পরে হরেন ঘোষের তত্ত্বাবধানে 'বুকের বোঝা' নামে একখানি ছবি তৈরি হয়, 'বুকের বোঝা'র গল্প হরেনবাবুর লেখা। ক্যামেরার কাজ করেছিলেন শ্রীযুক্ত নীতিন বোস। ছবিখানি হরেনবাবুর তত্ত্বাবধানে তোলা হলেও অর্থ দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়— যিনি এখন নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড-এর মালিক।

সেই সময় থেকেই আমরা শুনতে লাগলুম যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় সবাক চিত্র তৈরি করার চেষ্টা চলছে। সবাক চিত্র চিত্রজগতে যে এই যুগান্তর উপস্থিত করবে তখন কেউই তা মনে করতে পারেনি। পরন্তু চিত্রজগতের অনেক দিগ্‌গজ ব্যক্তি এবং চিত্রজগতের বাইরেরও অনেক বড়োলোক সবাক চিত্রের বিরুদ্ধে বাণী প্রচার করেছিলেন। যাই হোক, সে অন্য কথা।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার চিত্রজগতে আত্মপ্রকাশ করবার আগে আরও দুটি ছবি তৈরি করেছিলেন। সে-কোম্পানির নাম দেওয়া হয়েছিল দি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট। এঁরা পরলোকগত ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'চোরকাঁটা' নামক উপন্যাসখানির চিত্ররূপ প্রথমে দেন। এই চিত্রের নায়ক হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত রাজীব রায় এবং নায়িকা ছিলেন জ্যোৎস্না গুপ্তা। শ্রীমতী শান্তি গুপ্তাও এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। পরিচালনা করেছিলেন শ্রীচারু রায়। দ্বিতীয় ছবিখানি আমার 'চাষার মেয়ে' নামক উপন্যাসখানির চিত্ররূপ। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চন্দ মহাশয় এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। ছবির পরিচালনা করেছিলেন শ্রীপ্রফুল্ল রায়।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের ‘চিত্রা’ প্রেক্ষাগৃহ হবার কিছু পরেই সবাক চিত্র নির্মাণ করবার আয়োজন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ম্যাডান কোম্পানি R.C.A. শব্দগ্রহণযন্ত্র আনিয়ে কতকগুলি গান ও আবৃত্তি তুলেছিলেন। এই গানের ব্যাপারে নিসার হোসেন ভারতবিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন।

প্রথম বড়ো সবাক চিত্র তোলেন ইম্পিরিয়াল সিনেমা কোম্পানির শ্রীযুক্ত আর্দেশির ইরানি। আমাদের দেশের শ্রবণকুমারের গল্প নিয়ে চিত্রখানি তোলা হয়েছিল। এই চিত্রের নায়িকা ছিলেন জুবেদা এবং নায়ক ছিলেন নিসার হোসেন।

এর পরেই সবাক চিত্রের ইতিহাস, পরে সুবিধা হলে সে-কথা বলবার ইচ্ছে রইল।

পরিশিষ্ট

প্রযোজক সংস্থা ও প্রেক্ষাগৃহ

১ অরোরা সিনেমা কোম্পানি ১৯১১ সালে অনাদি বসুর সহযোগিতায় অরোরা সিনেমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন দেবী ঘোষ। অনাদি বসু নিজে অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন পরের বছর। এঁরা প্রথমে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেশি-বিদেশি ছবি দেখিয়ে বেড়াতেন। এঁদের অফিস ছিল উত্তর কলকাতার কাশী মিত্র ঘাট রোডে। ১৯২০ সাল নাগাদ এঁরা পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনিচিত্র নির্মাণ করতে মনস্থ করেন এবং সেই পূর্ণাঙ্গ নির্বাক ছবি 'রত্নাকর' মুক্তি পায় ১৩ আগস্ট ১৯২১-এ। ১৯২৯ সালে অনাদি বসু জি. রামসেসন নামক এক দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের সাহায্যে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন নামে আরেকটি কোম্পানি পত্তন করেন। এই কোম্পানির সঙ্গে অরোরা সিনেমা কোম্পানির কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং এই দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সংস্থা। ১৯৩৬ সালে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের নিজস্ব স্টুডিয়ো স্থাপিত হয় নারকেলডাঙায়। এঁদের প্রযোজিত নির্বাক ছবির মধ্যে 'পূজারী' (১৯৩১) এবং 'নিয়তি' (১৯৩৪) উল্লেখযোগ্য।

২ অ্যালবিয়ন ধর্মতলায় এস. এন. ব্যানার্জী রোডে অবস্থিত রিগ্যাল সিনেমার নাম আগে ছিল অ্যালবিয়ন থিয়েটার। একেবারে গোড়ায় এর নাম ছিল ইলেকট্রিক থিয়েটার। পরে হয় অ্যালবিয়ন। তারপর কিছুদিন নাম ছিল বিজু থিয়েটার। অবশেষে রিগ্যাল।

৩ **ইউ. এফ. এ. ফিল্ম কোম্পানি** UFA-এর সম্পূর্ণ নাম ইউনিভার্সাস ফিল্ম অ্যাকটিয়েনজেসেলশ্যাফট এ. জি.। জার্মানির এই চলচ্চিত্র সংস্থা ১৯১৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত বিশ্বের চলচ্চিত্রজগতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। জার্মানির দুই বৃহৎ চলচ্চিত্র সংস্থা 'নরডিস্ক' এবং 'ডেকলা'-র একত্রীকরণে UFA গঠিত হয়। একসময়ে হলিউডের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দেওয়া এই সংস্থার বিখ্যাত সিনেমার মধ্যে ড. মাবুসো (১৯২২), মেট্রোপোলিস (১৯২৭), মেরিলিন ডিয়েট্রিখের প্রথম ছবি দ্য ব্লু এঞ্জেল (১৯৩০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থা বর্তমানে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রযোজনায় নিযুক্ত।

৪ **দি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট** এই সংস্থা মাত্র দুটি ছবি প্রযোজনা করেন, 'চোরকাঁটা' এবং 'চাষার মেয়ে'। এঁদের অফিস ছিল ৪৯ ধর্মতলা স্ট্রিট ঠিকানায়। এরপর সবাক ছবির যুগে, এই সংস্থার কর্তৃপক্ষ ছবি প্রযোজনা করতে থাকেন।

৫ **ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি** এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে নীতীশচন্দ্র লাহিড়ীর সঙ্গী হয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পি. এন. দত্ত এবং জ্যোতিষচন্দ্র সরকার, পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন ননী সান্যাল। বনহুগলিতে বাগানবাড়ি ভাড়া করে এদের প্রথম ছবি 'বিলেত ফেরৎ'-এর শুটিং হয়েছিল।

৬ **ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়ো** ম্যাডান কোম্পানি টালিগঞ্জে যে-স্টুডিয়ো খুলেছিলেন, তার নাম ছিল ম্যাডান স্টুডিয়ো। অহীন্দ্র চৌধুরীর

আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, প্রথম দিকে স্টুডিয়োর মধ্যে কোনো বাড়ি ছিল না। প্রাচীর সংলগ্ন একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কাজ চালানো হতো। সেই বাড়িটির মালিক ছিলেন বিখ্যাত আইনজ্ঞ এবং কংগ্রেস কর্মী সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। মেক-আপ হতো গাড়ির মধ্যে। পরে ধীরে ধীরে স্টুডিয়ো ফ্লোর, ল্যাবরেটরি, এডিটিং রুম ইত্যাদি তৈরি হয়। এই স্টুডিয়োর পরে নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম হয় 'ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়ো'।

৭ **দি ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস** এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা কলকাতা নিবাসী ব্যবসায়ী ঘনশ্যামদাস চোখানি। তাঁকে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বাগমারি রোডে এঁদের নিজস্ব স্টুডিয়ো এবং ল্যাবরেটরি ছিল। অফিস ছিল ধর্মতলায়। 'পুনর্জন্ম' ছাড়া এঁদের প্রযোজিত নির্বাক ছবি 'শঙ্করাচার্য', 'নিষিদ্ধ ফল', 'অপহৃতা', 'কণ্ঠহার', 'ভাগ্যলক্ষ্মী', 'পুরদেশিয়া' এবং 'পরশমণি'। এই সংস্থার অধিকাংশ ছবি পরিচালনা করেন কালীপ্রসাদ ঘোষ।

৮ **ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স লিমিটেড** ১৯১৯ সালে নিরঞ্জন পাল প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রিটিশ অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানি' নামে সংস্থা। তবে এই প্রতিষ্ঠান বেশি দিন চলেনি। 'গডেস' নাটক ইংল্যান্ডে প্রদর্শিত এবং জনপ্রিয় হয় ১৯২২ সালে।

৯ **ইম্পিরিয়াল** মুম্বাইয়ের 'ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানি' এ-দেশে প্রথম সবাক ছায়াছবি 'আলম আরা'-র নির্মাতা। আর্দেশির এম. ইরানি এবং আবদুল্লালী ইয়োসোফাল্লীর যৌথ উদ্যোগে এই কোম্পানি স্থাপিত হয় ১৯২৬ সালে। এঁরা হিন্দি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু ছাড়া বার্মিজ এবং পারসিয়ান ভাষার ছবিও তৈরি করেন। বার্মিজ

ভাষার প্রথম চলচ্চিত্র এই সংস্থারই নির্মাণ। বিখ্যাত অভিনেত্রী জুবেদা সুলোচনা এঁদের ছবিতে অভিনয় করতেন।

১০ **এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস** ম্যাডানদের কোম্পানির পুরোনো নাম 'এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ' নামেই পরিচিত হতো ম্যাডান কোম্পানির এই প্রেক্ষাগৃহ। ১৯১২ সালে এটি পুনর্গঠন করা হয় এবং নতুন নাম হয় এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস।

১১ **কর্নওয়ালিশ থিয়েটার** হাতিবাগান অঞ্চলে শ্যামপুকুর এবং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে তাঁবু খাটিয়ে সিনেমা দেখাতেন ম্যাডান কোম্পানি। পরে সেখানে তাঁরা পাকা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করেন। নাম হয় 'কর্নওয়ালিশ' এবং 'ক্রাউন'। পরবর্তীকালে এঁরা পরিচিত হয় 'শ্রী' এবং 'উত্তরা' নামে।

১২ **কোরিন্থিয়ান থিয়েটার** এই প্রেক্ষাগৃহের মালিক ছিলেন জে. এফ. ম্যাডান। তিনি চলচ্চিত্র ব্যবসায় আসবার আগেই এটির মালিকানা অর্জন করেন। এখনকার লেনিন সরণিতে অবস্থিত এই সিনেমামহল বর্তমানে 'অপেরা' নামে পরিচিত।

১৩ **করোনেশন সিনেমা** এই প্রেক্ষাগৃহের সম্পূর্ণ নাম 'করোনেশন সিনেমাটোগ্রাফ অ্যান্ড ভ্যারাইটি হল'। মুম্বাইয়ের গিরগাঁম অঞ্চলে, স্যান্ডহার্স্ট রোডে ছিল এর অবস্থান।

১৪ **কালী ফিল্মস স্টুডিয়ো** প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর প্রতিষ্ঠা করা ইন্ডিয়া ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রির নাম ১৯৩৪ সালে বদলে হয় কালী ফিল্মস স্টুডিয়ো। শ্রীগাঙ্গুলীর অকালপ্রয়াত পুত্র কালীধনের স্মৃতি রক্ষার্থে এই নাম

পরিবর্তন ঘটানো হয়। কালী ফিল্মস স্টুডিয়োয় কোনো নির্বাক ছবি তৈরি হয়নি।

১৫ **কলম্বিয়া ফিল্ম কোম্পানি** ১৯১৯ সালে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় চলচ্চিত্র প্রযোজনা এবং বিতরণ সংস্থা কলম্বিয়া পিকচার্স ইন্ড্রাস্টিস ইনকরপোরেটেড। সম্ভবত এই সংস্থার কলকাতা-স্থিত অফিসের কথাই বলা হয়েছে। কলকাতায় আলাদা করে এই নামের কোনো সংস্থার সন্ধান পাওয়া যায় না। কলম্বিয়া পিকচার্স বর্তমানে জাপানের 'সোনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট' সংস্থার মালিকানাধীন।

১৬ **কোলহাপুর সিনেটোন** এই সংস্থা প্রযোজিত ছবিগুলির মধ্যে 'আকাশবাণী' (১৯৩৪), 'বিলাসী ঈশ্বর' (১৯৩৫), 'নিগহ্-এ নফরত' (১৯৩৫), 'হিন্দ মহিলা' (১৯৩৬), 'গঙ্গাবতরণ' (১৯৩৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৭ **ক্ল্যাসিক থিয়েটার** এমারেল্ড থিয়েটার কিনে নিয়ে ১৮৯৭-এর ষোলোই এপ্রিল ক্ল্যাসিক থিয়েটার আরম্ভ করেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম দিন অভিনীত হয় 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং 'লক্ষ্মণ বর্জন'। এরপর একে একে 'বেল্লিক বাজার', 'দক্ষযজ্ঞ', 'হারানিধি', 'আলিবাবা', 'ভ্রমর' ইত্যাদি। এই থিয়েটারের বিভিন্ন নাটকের দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত করে নাটক চলাকালীন দেখানো হতো। সেই 'বায়োস্কোপ' ক্ল্যাসিক থিয়েটারের অভিনয় তালিকায় জুড়ে তা বিজ্ঞাপিত করতেন অমরেন্দ্রনাথ। অনেকের মতে সেগুলিই প্রথম বাঙালি ফিল্ম।

১৮ **চিত্রা** উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে ১৯৩০ সালের ২০ ডিসেম্বর চিত্রা প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়। এর মালিক

ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। এখানে প্রদর্শিত প্রথম ছবি রাধা ফিল্মস-এর ‘শ্রীকান্ত’। আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রেক্ষাগৃহ উদ্‌বোধন করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৬৩ সালের ১৫ এপ্রিল (পয়লা বৈশাখ) থেকে এই চিত্রগৃহ ‘মিত্রা’ নামে পরিচিত হতে থাকে।

১৯ **তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি** নরেশচন্দ্র মিত্রর উৎসাহে এবং অনুপ্রেরণায় এবং ব্যারিস্টার বি. কে. ঘোষের অর্থে এই সংস্থার সৃষ্টি। একেবারে শুরু থেকেই এখানে যোগ দেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। এঁদের প্রথম ছবি শরৎচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে ‘আঁধারে আলো’। এই সংস্থার ছবির শুটিং হতো দমদম রোড আর নাগের বাজারের সংযোগস্থলে একটি বাগানবাড়িতে।

২০ **নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড** বীরেন্দ্রনাথ সরকারের উদ্যোগে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৩০ সালে। উল্লেখ্য এই যে, এই সংস্থার প্রযোজনায় কোনো নির্বাক ছবি তৈরি হয়নি। টালিগঞ্জের চণ্ডী ঘোষ রোডে এঁদের প্রথম স্টুডিয়োটির উদ্‌বোধন হয় ১৯৩০-এর ১৯ সেপ্টেম্বর। এটি ‘এন. টি. ওয়ান’ নামে খ্যাত। এই সংস্থার প্রতীক ‘হাতি’ এবং মন্ত্র (motto) ‘জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্‌’। কলকাতা, হাওড়া ছাড়া ভারতের অন্যান্য শহরে সিনেমা হাউস নির্মাণ করে এই সংস্থা। এঁদের প্রথম ছবি ‘দেনাপাওনা’ (১৯৩১)। এটি সবাক ছবি।

২১ **পাটনকার ফ্রেন্ডস কোম্পানি** এস. এন. পাটনকার এবং তাঁর চার বন্ধু কারাণ্ডিকার, দিভেকার, রানাডে এবং ভাতখণ্ডে একযোগে ছবি প্রযোজনা শুরু করেন। এঁদের প্রথম ছবি ‘সত্যবান সাবিত্রী’

(১৯১৪)। এ ছাড়া তাঁরা প্রযোজনা করেন 'দ্য মার্ডার অব নারায়ণ রাও পেশোয়া' (১৯১৫) ইত্যাদি। এঁদের সংস্থার নাম ছিল 'পাটনকার ইউনিয়ন'। ১৯১৭ সালে দ্বারকাদাস নারায়ণদাস সম্পৎ এঁদের ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকে এই সংস্থার নাম হয় 'পাটনকার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কোম্পানি'।

২২ **পারসি থিয়েটার** কলকাতায় পারসি সম্প্রদায়ের নিজস্ব থিয়েটার হল এবং নাট্যদলকে বলা হতো পারসি থিয়েটার। ম্যাডান কোম্পানির 'মিশরের রাণী' (১৯২৫) ছবিতে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, কৃষ্ণভামিনী এবং নীহারবালা ছাড়া অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রায় সকলেই ছিলেন পারসি থিয়েটারের কর্মী। তাঁদের মধ্যে একজন, নাসিরওয়ানজি, ওই ছবিতে দাউদ শা-র ভূমিকায় অভিনয় করেন।

২৩ **প্রভাত কোম্পানি** ১৯২৯ সালে কোলহাপুরে প্রভাত ফিল্ম কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন রাজারাম ভানাকুদরে শান্তারাম, সংক্ষেপে ভি. শান্তারাম এবং তাঁর অংশীদার ভি. জি. দামলে, কে. আর. ধাইবার, এস. ফতেলাল এবং এস. বি. কুলকার্নি। ১৯৩৩-এ কোলহাপুর থেকে পুণায় নিয়ে আসা হয় এই সংস্থাকে। এঁরা সামান্য কয়েকটি নির্বাক ছবি করলেও তা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। ১৯৩২-এ এঁদের প্রথম সবাক ছবি মারাঠি ও হিন্দি ভাষায় তৈরি 'অযোধ্যাছে রাজা'-য় অভিনয় করেন কোলহাপুর-নিবাসী উচ্চবর্ণের পরিবারের মেয়ে দুর্গা খোটে। এই সংস্থা মারাঠি ভাষা ছাড়া হিন্দি এবং তামিল ভাষার ছবিও নির্মাণ করেছে। ১৯৩৬-এর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রভাত

কোম্পানি প্রযোজিত হিন্দি ছবি 'অমর জ্যোতি' প্রদর্শিত হয় এবং পরের বছর মারাঠি ভাষায় তৈরি ছবি 'সন্ত তুকারাম' ভেনিস উৎসবে প্রথম ভারতীয় ছবি হিসেবে পুরস্কার পায়।

২৪ প্যাথে কোম্পানি শার্ল, এমিল, থিওফিল এবং জাক প্যাথে— এই চার ভাই মিলে ১৮৯৬-এর আটাশে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সোসিয়েত প্যাথে ফ্রেরিজ' (যার অর্থ: প্যাথে ব্রাদার্স কোম্পানি) সংস্থা। প্রথমে ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের ব্যাবসা শুরু করলেও পরে মোশন পিকচার্সের ব্যবসায়ে মন দেয় এই সংস্থা। ১৯০২-এ ল্যুমিয়ে ব্রাদার্সের থেকে ক্যামেরা এবং ফিল্ম তৈরির পেটেন্ট নেয় প্যাথে। সংস্থা আরও বড়ো হলে তার নাম হয় 'কম্পেইন জেনেরেল দে এটাব্লিশমেন্টস প্যাথে ফ্রেরেজ ফোনোগ্রাফস অ্যান্ড সিনেম্যাটোগ্রাফস' সংক্ষেপে সি. জি. পি. সি.। ১৯০৯ সালের মধ্যে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে প্যাথে কোম্পানির দুশোরও বেশি চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়। ১৯২৭-এ ইংল্যান্ডের স্টুডিয়োগুলি 'ইস্টম্যান কোডাক' কোম্পানিকে বিক্রি করে দেয় প্যাথে। প্যাথে সংস্থা একবিংশ শতকেও সিনেমা প্রযোজনা, পরিবেশনা, প্রদর্শন এবং অন্য নানা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে।

২৫ ফোটো-প্লে সিন্ডিকেট অব ইন্ডিয়া অহীন্দ্র চৌধুরী এবং প্রফুল্ল ঘোষের উদ্যোগে এই সংস্থা গড়ে ওঠে। এঁদের স্টুডিয়ো ছিল বেহালা ট্রাম ডিপো থেকে পূর্ব দিকে, মাইল খানেক ভেতরে। অফিস ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটে। এঁদের তৈরি ছবিগুলির মধ্যে একটিমাত্র ছবিই নির্বাক। সেটির নাম 'Soul of a Slave' বা 'বাঁদির প্রাণ'।

২৬ **মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ** মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ বা মনোমোহন থিয়েটার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণে। প্রথমটি হল এখানে অরোরা সিনেমা কোম্পানির দেবী ঘোষ 'বিষবৃক্ষ' নাটকের চলচ্ছবি তুলে নাটকের সঙ্গে দেখানো শুরু করেন। অপর কারণটি, ১৯২৮-এর জানুয়ারি মাসে এই প্রেক্ষাগৃহে থিয়েটার বন্ধ হয়ে ছায়াছবি প্রদর্শন শুরু হয়। থিয়েটার বন্ধ হয় ব্যাবসা খারাপের জন্য নয়, শুধুমাত্র বায়োস্কোপকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য। কারণ সে-সময়ে অবাঙালি প্রেক্ষাগৃহে বাঙালির তোলা ছবি প্রদর্শনে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করা হতো। এখানে প্রদর্শিত প্রথম ছবিটি হল ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট-এর 'দেবদাস'।

২৭ **ম্যাডান কোম্পানি** জে. এফ. ম্যাডান প্রতিষ্ঠিত 'ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড'। এঁদের ছবি দেখাবার ব্যাবসা শুরু ১৯০১ বা ১৯০৫ সাল থেকে। এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ নামে এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ছবি দেখাতেন। বর্তমানে চৌরঙ্গি এবং নেলী সেনগুপ্ত সরণি বা লিন্ডসে স্ট্রিটের সংযোগস্থলের বিপরীতে, মনোহর দাস তড়াগের উত্তরে ছিল ম্যাডান কোম্পানির তাঁবু। এঁরা উত্তর কলকাতায় হাতিবাগান অঞ্চলে আরও দুটি প্রেক্ষাগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের নাম কর্নওয়ালিশ এবং ক্রাউন, পরবর্তীকালে শ্রী এবং উত্তরা। প্রথম দিকে বিদেশ থেকে নিয়ে আসা ছবি দেখালেও পরে এই সংস্থা নিজেরাই ছবি প্রযোজনা ও পরিবেশন শুরু করেন। ১৯১৯ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ম্যাডান কোম্পানি চল্লিশটিরও বেশি নির্বাক ছায়াছবি নির্মাণ করেন। এঁদের শেষ নির্বাক ছবি সম্ভবত

'মাধবীকঙ্কণ'। সেটি ১৯৩২-এর ৯ জুলাই এম্প্রেস থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়।

২৮ **রক্সি থিয়েটার** চৌরঙ্গি প্লেসে অবস্থিত পূর্বতন এম্পায়ার সিনেমা। ১৯৩৯ সালে এর নামকরণ হয় রক্সি থিয়েটার।

২৯ **রঞ্জিত সিনেটোন** এর প্রধান উদ্যোক্তা চান্দুলাল শা এবং মিস গহর। এঁরা 'Why Husband go Astray' এবং আরও কিছু নির্বাক ছবিতে সাফল্যের পর সবাক ছবি তৈরি করতে আরম্ভ করেন। প্রধানত হিন্দি, পাঞ্জাবি এবং গুজরাটি ভাষায় ছবি তৈরি করত এই সংস্থা।

৩০ **রসা থিয়েটার** কলকাতার বিত্তবান বাঙালিরা ভবানীপুরে রসা থিয়েটার নির্মাণ করেন। এই বিত্তবানদের অন্যতম হলেন মহেন্দ্র মিত্র এবং জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষের পুত্র কাকু ঘোষ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সালে এখানে প্রথম ছবি দেখানো হয়। ছবির নাম 'বিলেত ফেরৎ'। প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হয়েছিল তেলেনিপাড়ার ব্যানার্জী পরিবারের জমিতে। তাঁরাই ছিলেন এর আসল মালিক। থিয়েটারের প্রথম দিন সাহিত্যিক সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে স্টেজে উঠিয়ে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। পরে এই প্রেক্ষাগৃহের নাম হয় 'পূর্ণ থিয়েটার'।

৩১ **রয়্যাল অপেরা** মুম্বাই শহরের রয়্যাল অপেরা হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর ১৯০৯-এ স্থাপিত হয় এবং দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১৯১১-তে। দ্বারোদ্ঘাটন করেন ইংল্যান্ডেশ্বর রাজা পঞ্চম জর্জ। উনিশশো ত্রিশের দশকে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হলে এখানে সিনেমা দেখানো আরম্ভ হয়। তার আগে পর্যন্ত এখানে অপেরাই অনুষ্ঠিত হতো। এখানে শেষ

ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়েছে ১৯১১-এর জানুয়ারি মাসে। বর্তমানে এটি ভগ্নদশায় বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু ২০০৮ সালে মহারাষ্ট্র সরকার এটি সংস্কারের কথা ঘোষণা করেছে।

৩২ **লন্ডন বায়োস্কোপ** ১৮৯৬-১৮৯৭ সালে মি. স্টিফেনস নামক এক ইংরেজ স্টার থিয়েটারে প্রথম চলচ্চিত্র বা মুভি দেখান। সেই চলচ্চিত্রের নাম ছিল 'বায়োস্কোপ'। হীরালাল সেন সিনেমা দেখাতে শুরু করেন ১৮৯৮ সালে। তাঁর সংস্থার নাম ছিল রয়েল বায়োস্কোপ। হীরালাল সেনের ভাগ্নে কুমার শঙ্কর গুপ্ত বলরাম দে স্ট্রিটের বসাকদের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন 'লন্ডন বায়োস্কোপ কোম্পানি'। পরে এর মালিক হল নারায়ণ বসাক। ১৯১৩ সালে হীরালাল সেনের রয়েল বায়োস্কোপ বন্ধ হলে তিনি কর্মচারী হিসেবে লন্ডন বায়োস্কোপ কোম্পানিতে যোগদান করেন।

৩৩ **লোটাস ফিল্ম কোম্পানি** ১৯২২-এ প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা গঠিত হয়েছিল হায়দ্রাবাদে। হায়দ্রাবাদের নিজামের সুনজরে থাকায় এর বেড়ে উঠতে অসুবিধা হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যেই এদের নিজস্ব ল্যাবরেটরি এবং দুটি সিনেমা হল স্থাপিত হয়। নিজাম নিজের প্যালেসের বিভিন্ন অংশে শুটিঙের অনুমতিও দেন। এই কোম্পানির তৈরি অন্য ছবিগুলি হল 'ম্যারেজ টনিক', 'হরগৌরী', 'দ্য স্টেপমাদার' এবং 'সতী-সীমন্তিনী'। ১৯২৪ সালের কোনো সময়ে এই সংস্থার একটি প্রেক্ষাগৃহে মুম্বাই শহরে নির্মিত 'রাজিয়া বেগম' নামে একটি ছবি প্রদর্শিত হয়। সেই ছবিতে দেখানো হয়েছিল এক মুসলমান রানির সঙ্গে এক হিন্দু যুবকের প্রেম। ছবিটি মুম্বাইয়ে ভালো চললেও

নিজাম ক্ষুব্ধ হলেন ছবিটি দেখে এবং একদিনের নোটিশে লোটাস ফিল্ম কোম্পানিকে হায়দ্রাবাদ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করলেন।

৩৪ **শালিনী সিনেটোন** ‘উষা’ (১৯৩৫), ‘রাজমুকুট’ (১৯৩৪), ‘প্রতিভা’ (১৯৩৭), ‘কান্‌হোপত্র’ (১৯৩৭) প্রভৃতি ছবি এই সংস্থার প্রযোজনা।

৩৫ **সরোজ** ঠিক এই নামে কোনো চিত্র-প্রতিষ্ঠানের সন্ধান এই মুহূর্তে পাওয়া না গেলেও ত্রিশের দশকে মুম্বাই অঞ্চলে গড়ে ওঠা আরও কয়েকটি সংস্থা হল ওয়াডিয়া মুভিটোন, সারদা ফিল্ম কোম্পানি ইত্যাদি।

৩৬ **সাগর** উনিশশো ত্রিশের দশকে ব্যাঙ্গালোরের কয়লা ব্যবসায়ী এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শক চীমনলাল দেশাই মুম্বাইতে এসে ‘সাগর মুভিটোন’ প্রতিষ্ঠা করেন। সবাক চলচ্চিত্রের যুগে এই সংস্থা হিন্দি, তামিল, তেলেগু এবং পাঞ্জাবি ভাষায় ছবি নির্মাণ করেছেন। গুজরাতি ভাষায় প্রথম সিনেমা এই সংস্থার তৈরি।

৩৭ **হিমানজুরাই প্রোডাকসন্স** এটি সম্ভবত ইংরেজ শিল্পীদের উচ্চারণে ‘হিমাংশু রায় প্রোডাকসন্স’, অর্থাৎ হিমাংশু রায়ের পূর্বতন কাজগুলির কথা বলা হয়েছে।

চলচ্চিত্র

১ **আঁধারে আলো** কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত প্রথম ছায়াছবি, মুক্তি পায় ১৯২২-এর তেইশে

সেপ্টেম্বর মনোমোহন থিয়েটারে। পরিচালনা করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং নরেশ মিত্র। দুই পরিচালক ছাড়া এই ছবিতে অংশগ্রহণকারী অন্য অভিনেতাদের মধ্যে লীলা দেবী, কনকবালা, দুর্গারাণী, যোগেশ চৌধুরী এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

২ **ইন্দ্রজিৎ** ছবিটির সম্পূর্ণ নাম 'ইন্দ্রজিৎ ও লেডি টিচার'। রসা থিয়েটারে এই ছবি মুক্তি পায় ১৯২২-এর ১৯ আগস্ট। কাহিনি এবং পরিচালনা ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের। তিনি অভিনয়ও করেন দ্বৈত-ভূমিকায়। ভারতীয় ছবিতে এই প্রথম দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয়।

৩ **England Returned** এই ছবির বাংলা নাম দেওয়া হয়েছিল 'বিলেত ফেরৎ'। কাহিনি, চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা সবই নীতীশ লাহিড়ীর। এটি ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত প্রথম ছবি। ছয় রিলের ছবিটিতে অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন মন্মথ পাল, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, সুশীলা মুখোপাধ্যায়, নৃপেন বসু, শিশুবালা প্রমুখ।

৪ **কচ ও দেবযানী** মহাভারতের উপকাহিনির ঘটনা অবলম্বনে এই ছবিটি এস. এন. পাটনকার নির্মাণ করেন পায়োনিয়ার ফিল্ম কোম্পানির ছত্রছায়ায়।

৫ **কর্মা** এই ছবি পরিচালনা করেন জে. এল. ফ্রিয়ার-হান্ট, অভিনয় করেছিলেন দেবিকারাণী, হিমাংশু রায়, আব্রাহাম শোফের, সুধারাণী প্রমুখ। ভারতীয় মহারানির প্রতিবেশী রাজ্যের রাজকুমারের প্রেমে পড়ার কাহিনি নিয়ে তৈরি ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৩৩ সালে। ছবিতে একটি দীর্ঘ চুম্বনদৃশ্য সে-যুগে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি করে।

৬ **কমলেকামিনী** এই ছবি মুক্তি পায় ১৯২৪-এর তেইশে ফেব্রুয়ারি, এম্প্রেস থিয়েটারে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত এবং অভিনীত ছবিটিতে অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রমোহন রায়, প্রবোধ বসু, বসন্তকুমারী, কুসুমকুমারী এবং দ্বৈত ভূমিকায় পেসেন্স কুপার।

৭ **কৃষ্ণসখা সুদামা** ১৯২২-এর পয়লা জানুয়ারি অ্যালায়েড থিয়েটারে জে. জে. ম্যাডান পরিচালিত 'কৃষ্ণ-সুদামা' মুক্তি পায়। কিন্তু এই ছবির প্রযোজক ছিলেন কোহিনুর ফিল্ম কোম্পানি। অরোরা সিনেমা কোম্পানির ছবিটির নাম 'কৃষ্ণসখা'। ১৯২৭-এর নয়ই জানুয়ারি পূর্ণ থিয়েটারে মুক্তিপ্রাপ্ত আট রিলের এই ছবিটির পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরী। অভিনয় করেছিলেন সন্তোষ সিংহ, ব্রজেন্দ্র সরকার, সরস্বতী দেবী, ফিরোজাবালা, সুশীল ঘোষ, তারকবালা প্রমুখ।

৮ **খোকাবাবু** ২৫ আগস্ট ১৯২৩-এ রসা থিয়েটারে মুক্তিপ্রাপ্ত দু-রিলের এই ছবিটির পরিচালক এবং কাহিনিকার ছিলেন নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী। অন্য ভূমিকায় ছিলেন নরেশ মিত্র এবং নগেন্দ্রবালা।

৯ **গঙ্গাবতরণ** দাদাসাহেব ফালকের শেষ ছবি 'গঙ্গাবতরণ' সবাক ছবি। এটি হিন্দি এবং মারাঠি— দুই ভাষায় তৈরি হয়। প্রায় দু-বছর সময় নিয়ে নির্মিত এই ছবির প্রযোজক ছিলেন কোলহাপুর সিনেটোন। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৩৪-এ। ঋষি ভগীরথের স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক কাহিনি এই ছবির বিষয়বস্তু।

১০ গোমাতা দোসরা ফেব্রুয়ারি উনিশশো চব্বিশ সালে ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে ছয় রিলের ছবিটি মুক্তি পায়। এটির বিষয়ে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

১১ চন্দ্রনাথ মুক্তি পেয়েছিল রসা থিয়েটারে। দৈর্ঘ্য দশ রিল। পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্র। দুর্গাদাস ছাড়া অন্য চরিত্রাভিনেতারা হলেন নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, নির্মলবালা, শিশুবালা, মিস লাইট। প্রসঙ্গত এটি দুর্গাদাসের প্রথম অবতরণ নয়। তিনি প্রথম অভিনয় করেন শরৎচন্দ্রেরই কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত 'আঁধারে আলো' ছবিতে।

১২ চাষার মেয়ে বারো রিলের ছবি। মুক্তি পেয়েছিল চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে ১৯৩১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। অভিনেতারা হলেন জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়ো), কুঞ্জলাল সেন, চানী দত্ত, জ্যোৎস্না গুপ্ত, রেণু দেবী, প্রেমকুমারী নেহরু, মনোরমা দেবী প্রমুখ।

১৩ চোরকাঁটা এগারো রিলের ছবি 'চোরকাঁটা' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩১ সালের ৩ এপ্রিল তারিখে, চিত্রায়। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হলেন অমর মল্লিক, দিলীপ গুপ্ত, কোকেন চট্টোপাধ্যায়, মনোরমা দেবী প্রমুখ। এটি জ্যোৎস্না গুপ্তের প্রথম ছবি।

১৪ তারা দি ড্যান্সার 'নর্তকী তারা' নামে বিজ্ঞাপিত এই ছবির পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে ছিলেন পেসেন্স কুপার এবং প্রবোধ বসু। এম্প্রেস থিয়েটারে ১৯২২-এর তেইশে সেপ্টেম্বর মুক্তি পায় ছয় রিলের এই ছবিটি।

১৫ দব্বুর কেলেঙ্কারী দুই রিলের ছোট্ট এই ছবিটি (বিজ্ঞাপিত নাম ডাব্বুর কেলেঙ্কারী) পরিচালনা করেছিলেন দেবী ঘোষ। অভিনেতা চানী দত্তর এটি প্রথম অভিনীত ছবি।

১৬ দেবদূত অরোরা প্রযোজিত ছবির তালিকায় এই নামের কোনো ছায়াছবির নাম দেখা যায় না। অবশ্য সবাক যুগে, স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে লীলাময়ী পিকচার্স লিমিটেড প্রযোজিত এই নামের একটি ছবি অরোরা দ্বারা পরিবেশিত হয়।

১৭ দ্য থ্রো অব আ ডাইস মহাভারতের বিখ্যাত পাশা খেলার ঘটনা নিয়ে লেখা কাহিনির ভিত্তিতে এই ছবি নির্মিত। ছবির নায়িকা ছিলেন সীতা দেবী। ১৯৩০ সালে ছবিটি তোলা হয় ইংল্যান্ডের ব্রুস উলফ এবং জার্মানির UFA, এই দুই সংস্থার সহায়তায়। ছবিটি পরিচালনা করেন ফ্রাঞ্জ অস্টেন। মধু বসু এবং মায়া রায়ও অভিনয় করেন এই ছবিতে। ছবিটি 'প্রপঞ্চপাশ' নামেও পরিচিত।

১৮ দ্য লাইট অব এশিয়া 'প্রেম সন্ন্যাস' নামে পরিচিত এই ছবি মুক্তি পায় ১৯২৫-এ। ভারত-জার্মানি যৌথ উদ্যোগে নির্মিত ছবিটির জার্মান ভাষায় নামকরণ হয়েছিল 'ডাই ল্যুখটে এশিয়েন্স'। পরিচালক ফ্রানজ অস্টেন। ছবির অধিকাংশ চিত্রগ্রহণ হয়েছিল লাহোরে। শুটিঙের সময়ে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন জয়পুরের মহারাজা। বুদ্ধদেবের ভূমিকায় হিমাংশু রায় স্বয়ং, গোপার ভূমিকায় সীতা দেবী, মায়াদেবীর ভূমিকায় রাণীবালা এবং রাজা শুদ্ধোধনের ভূমিকায় সারদা উকিল এই ছায়াছবিতে অভিনয় করেন।

১৯ দ্য লাভস অব আ মুঘল প্রিন্স ইস্টার্ন ফিল্ম কর্পোরেশন প্রযোজিত এই ছবিটির নাম কখনও 'সিরাজ ও আনারকলি' বা 'মুঘল রাজকুমারের প্রেম' দেখা গেছে। অভিনয় করেছিলেন চারু রায়, প্রফুল্ল রায় এবং মায়া রায়। পরিচালনা সম্ভবত চারু রায় এককভাবেই করেন।

২০ দ্য সোল অব আ স্লেভ এই ছবির বাংলা ভাষায় প্রচলিত নাম 'বাঁদির প্রাণ'। অহীন্দ্র চৌধুরীর কাহিনি-পরিকল্পনায় সাত রিলের ছবিটি পরিচালনা করেন হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রদর্শনী কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে। এতে অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল ঘোষ, গোকুল নাগ, যুগল বসু, মিসেস অ্যাডলি উইলসন রিথ, মিসেস জুন রিচার্ডস। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্বে ছিল ম্যাডান থিয়েটার্স।

২১ ধ্রুবচরিত্র ১৯২১-এর এপ্রিল মাসে কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে মুক্তি পাওয়া এই ছবিটির পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় করেছিলেন পেসেন্স কুপার, মাস্টার মোহন, মণিলাল, পি. ম্যানেল্লি, এফ. ম্যানেল্লি, দাদাভাই সরকারি, জেমস ম্যাকগ্রা, পেস্টনজি ম্যাডান প্রমুখ। ছবিটির দৈর্ঘ্য আট রিল।

২২ নলদময়ন্তী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অভিনেত্রী পেসেন্স কুপারের প্রথম ছবি নলদময়ন্তী। তিনি অভিনয় করেন দময়ন্তীর চরিত্রে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন কেকি আদজানিয়া, দে লিগোয়োরো, অ্যালবার্টিনা, খুর্শিদ বিলমোরিয়া, মাস্টার মোহন, পি. ম্যানেল্লি, এফ. ম্যানেল্লি প্রমুখ। ছবিটি মুক্তি পায় ২৬ নভেম্বর ১৯২১ সালে রসা থিয়েটারে।

২৩ নুরজাহান মুঘল সম্রাজ্ঞী নুরজাহান-এর জীবনাশ্রয়ী আট রিলের এই ছবির পরিচালক জে. জে. ম্যাডান। পেসেন্স কুপার অভিনয়

করেন নুরজাহানের ভূমিকায়। অন্যান্য ভূমিকায় দাদাভাই সরকারি, চার্লস ক্রিড, অ্যালবার্টিনা, এজরা মির প্রমুখ। ১৯২৩-এর উনিশে মে রসা থিয়েটারে এটি প্রথম প্রদর্শিত হয়।

২৪ **পতিভক্তি** দশ রিলের ছবিটি একই নামের একটি জনপ্রিয় নাটকের চিত্ররূপ। এতে অভিনয় করেন মাস্টার মোহন, পেসেন্স কুপার, মিস কার্জন প্রমুখ। ১৯২২-এর ছাব্বিশে জুলাই করিন্থিয়ান থিয়েটারে এটি মুক্তি পায়। পরে ১৯২৩, ১৯২৪ এবং ১৯৩২ সালের বিভিন্ন সময়ে এটি শহরের অন্যান্য স্থানে প্রদর্শিত হয়।

২৫ **পত্নীপ্রতাপ** সতেরো রিলের এই ছবি মুক্তি পায় দোসরা ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ সালে কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে। পরিচালনা জে. জে. ম্যাডানের, এ-ছবিতে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেন পেসেন্স কুপার।

২৬ **প্রিন্সেস বুদৌর** এই ছবিটি ১৯২২-এ মুক্তি পেলেও এর নাম ছাড়া আর বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ছবিটির বাংলা নাম ছিল 'রাজকুমারী বুড়ুর'।

২৭ **পুনর্জন্ম** এই ছবি কলকাতায় মুক্তি পায় ১৯২৭-এর ছাব্বিশে নভেম্বর কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে। দশ রিলের ছবিটি পরিচালনা করেন জয়গোপাল পিল্লাই। মুখ্য অভিনেতারা হলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল সেন, এস. সি. মুখোপাধ্যায়, আরতি দেবী, ইন্দিরা দেবী এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় 'বড়ো ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়' হিসেবে পরিচিত।

২৮ **বসন্তপ্রভা** সাত রিলের এই ছবিটির মুক্তির তারিখ বা স্থান জানা যায়নি। এতে অভিনয় করেছিলেন প্রদোষ বসু, এম. হুসেন, প্রভা দেবী এবং কুসুমকুমারী।

২৯ **বিজয় বসন্ত** 'বিজয় অ্যান্ড বসন্ত' মুক্তি পেয়েছিল এম্প্রেস থিয়েটারে ১৯২৪ সালের ৬ জানুয়ারি তারিখে। সাত রিলের এই ছবির কাহিনি অমৃতলাল বসুর, পরিচালনা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের, পরিচালক নিজে ছাড়া অভিনয় করেন সীতা দেবী এবং মিস জায়বেলা।

৩০ **বিল্বমঙ্গল** কলকাতায় তৈরি প্রথম ছবি হিসেবে খ্যাত বিল্বমঙ্গল-এর পরিচালক রুস্তমজি ধোতিওয়ালা এবং কাহিনি চাম্পসি উদেশী। দশ রিলের ছবিটিতে সাধক বিল্বমঙ্গলের জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন মিস কায়ুম মামজিওয়ালা গহর— 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখা যায় এটি প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯১৯-এর পয়লা নভেম্বর। সন্ধ্যা ছ-টা পনেরো এবং রাত সাড়ে ন-টায় একটি করে শো হয়েছিল।

৩১ **বিষবৃক্ষ** বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনি 'বিষবৃক্ষ' চিত্রায়িত হয় জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। নয় রিলের এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নীরদাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, বসন্তকুমারী প্রমুখ। এটি নীরদাসুন্দরীর প্রথম আবির্ভাব।

৩২ **বিষ্ণু অবতার** কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে মুক্তিপ্রাপ্ত চার রিলের এই ছবিটি পরিচালনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছবিতে পেসেন্স কুপার অভিনয় করেন। চিত্রগ্রাহক ক্যামিল দে গ্র্যান্ড।

৩৩ **বুকের বোঝা** ছয় রিলের এই ছবি মুক্তি পায় পূর্ণ থিয়েটারে ১৯৩০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। আর্য ফিল্মস প্রযোজিত ছবিটির পরিচালক ছিলেন নীতিন বসু। অভিনয় করেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বোকেন চট্টোপাধ্যায়, বীণা দত্ত, প্রীতি মজুমদার, রেণুকা ঘোষ, গৌরী ওঝা প্রমুখ।

৩৪ **বেহুলা** হাওড়া ময়দানের তাঁবুতে বেহুলা মুক্তি পায় ১৯২২-এর চৌঠা ফেব্রুয়ারি। সাত রিলের এই ছবিতে শ্রেষ্ঠাংশে তথা নামভূমিকায় অভিনয় করেন পেসেন্স কুপার। পরিচালক সি. দে গ্র্যান্ড।

৩৫ **ভক্ত প্রহ্লাদ** এস. এন. পাটনকার 'ভক্ত প্রহ্লাদ' ছবি নির্মাণ করেন ১৯১৭ সালে।

৩৬ **ভগীরথ গঙ্গা** পেসেন্স কুপার এবং দাদাভাই সরকারি অভিনীত ছয় রিলের এই চলচ্চিত্র মুক্তি পায় তেসরা জুলাই ১৯২২ সালে করিন্থিয়ান থিয়েটারে।

৩৭ **ভীষ্ম** মাস্টার মোহন এবং কেকি আদজানিয়া অভিনীত এই ছবির পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৯ জুলাই ১৯২২-এ এম্প্রেস থিয়েটারে এটি মুক্তি পায়। ছবিটির দৈর্ঘ্য পাঁচ রিল।

৩৮ **মহাভারত** আট রিলের ছবি মহাভারত মুক্তি পায় .১৯২০-র তেরোই জানুয়ারি। ছবিটি পরিচালনা করেন রুস্তমজি ধোতিওয়ালা। 'নাচঘর' পত্রিকার সমালোচনায় দেখা যায় গড়ের মাঠে গৃহীত 'অভিমন্যু বধের' দৃশ্যের পেছনে দূরের রাস্তায় চলমান ট্রামগাড়ি দেখা গিয়েছিল এই ছবিতে।

৩৯ **মাতৃস্নেহ** ১৭ মার্চ ১৯২৩-এ কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে প্রথম প্রদর্শিত ছবিটির পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে ছিলেন অক্ষয় চক্রবর্তী, অমর চৌধুরী, পেসেন্স কুপার, নীরদাসুন্দরী, সুশীলাসুন্দরী, প্রভা দেবী, কালিদাসী দেবী প্রমুখ। এটি প্রভা দেবীর প্রথম ছবি।

৪০ **মা দুর্গা** সাত রিলের এই ছবিটির পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২১-এর পনেরোই অক্টোবর অর্থাৎ দুর্গাপুজোর সময়ে কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে এটি মুক্তি পায়।

৪১ **মানভঞ্জন** 'মানভঞ্জন' প্রদর্শনের তারিখ নিয়ে দ্বিমত আছে। বিভিন্ন সূত্রে দেখা যাচ্ছে এটি প্রথম দেখানো হয়েছিল ১৯২৩-এর আঠারোই জুন কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত এটি প্রথম চলচ্চিত্র। দৈর্ঘ্য আট রিল। পরিচালক নরেশ মিত্র। অন্যান্য অভিনেতারা হলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমারাণী, লীলা দেবী, সোমা দেবী প্রমুখ।

৪২ **মিস্ট্রিজ অব প্যারিস** ইউজিন স্যু রচিত ফরাসি ভাষায় 'লে মিস্টেরেজ দে পারি' ১৮৪২ থেকে ১৮৪৩ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'জার্নাল দে ডিবেটস' পত্রিকায়। পারি শহরের বিভিন্ন মহলে কাল্পনিক রাজ্য জেরোলস্টেন-এর গ্র্যান্ড ডিউকের রুডলফ ছদ্মনামে বিচরণ এবং বিহরণ এই কাহিনির বিষয়বস্তু। এড কর্নেলের পরিচালনায়, বোস্টনের হাব সিনেমাগ্রাফ কোম্পানি ১৯২০ সালে প্রথম এই কাহিনি অবলম্বনে ছায়াছবি তৈরি করে। বিভিন্ন ভূমিকায়

অভিনয় করেছিলেন রবার্ট কার্লসন, মেরি কাল্ডওয়েল, এমিলি ফুলার প্রমুখ।

৪৩ **মোহিনী** অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রথম ছবি। পরিচালনাও তাঁরই। অন্যান্য অভিনেতারা হলেন পেসেন্স কুপার, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিস অ্যালবার্টিনা, শেফালিকা ইত্যাদি। কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে ১৯২২-এর দোসরা সেপ্টেম্বর এটি মুক্তি পায়।

৪৪ **ম্যারেজ মার্কেট** ১৯২২-এর চোদ্দোই অক্টোবর মুক্তিপ্রাপ্ত পাঁচ রিলের এই ছবিটির বিজ্ঞাপনে বাংলায় নাম লেখা হয়েছিল 'বিয়ের বাজার'। প্রথম প্রদর্শিত হয় কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে। চিত্তরঞ্জন গোস্বামী পরিচালিত এবং অভিনীত এই ছবির অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন অক্ষয় চক্রবর্তী, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নীরদাসুন্দরী, হরিসুন্দরী, নৃপেন বসু প্রমুখ শিল্পীরা।

৪৫ **যশোদানন্দন** আট রিলের এই ছবি নীতীশ লাহিড়ী এবং ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যৌথভাবে পরিচালনা করেন। কাহিনি নীতীশ লাহিড়ীর। ১৯২২-এর পাঁচই জুন রসা থিয়েটারে প্রথম প্রদর্শিত ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীলাবালা, মন্মথ পাল, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, প্রমোদাসুন্দরী, আমোদিনী দাসী এবং নীতীশ লাহিড়ী।

৪৬ **রত্নাকর** প্রথম প্রদর্শনী রসা থিয়েটারে। কাহিনিকার এবং পরিচালক সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়। সাত রিল দীর্ঘ ছবিটিতে মুখ্য-ভূমিকায় অভিনয় করেন চুনিলাল, সুশীলাবালা এবং শশীমুখী।

৪৭ **রত্নাবলী** জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত সাত রিলের 'রত্নাবলী' কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে মুক্তি পায় ১৯২২-এর চৌঠা মার্চ। মুখ্য-ভূমিকায় ছিলেন মিস গহর, মিস পেসেন্স কুপার, মিস অ্যালবার্টিনা, ক্যামিল দে গ্র্যান্ড প্রমুখ।

৪৮ **রাজা পরীক্ষিৎ** ১৯২২-এর পয়লা জুলাই ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে মুক্তি পায় তিন রিলের এই ছবিটি। শ্রীমদ্‌ভাগবৎ অবলম্বনে বিন্যস্ত হয়েছিল এই ছবির কাহিনি।

৪৯ **রাজা ভোজ** ছবিটি মুক্তির সাল ১৯২২। সম্ভবত এটি কাশী নরেশ ভোজ-এর বিভিন্ন কীর্তিকলাপের কাহিনি নিয়ে তৈরি। বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না।

৫০ **রামায়ণ** মোট একুশ রিলের এই ছবি দেখানো হয়েছিল চারটি আলাদা অংশে। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির প্রথম অংশটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯২২-এর ২২ জুলাই ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে। পেসেন্স কুপার, শ্রীমতী এফ. ম্যানেলি, মাস্টার ভগবান দাস প্রমুখ এই ছবিতে অভিনয় করেন।

৫১ **লায়লা মজনু** লায়লা এবং মজনুর প্রেমকাহিনিকে মূল উপজীব্য করে নির্মিত নয় রিলের এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন জে. জে. ম্যাডান। এইচ. বি. ওয়্যারিং, জ্যানেট্রা শেরউইন, পেসেন্স কুপার এবং মিসু ডট ফয় অভিনীত এই ছবিটি করিন্থিয়ান থিয়েটারে ১৯২২-এর ৯ জানুয়ারি মুক্তি পায়।

৫২ **লাইফ অব জিসাস ক্রাইস্ট** ফ্রান্সের প্যাথে বা পাথে কোম্পানির তৈরি 'দ্য লাইফ অ্যান্ড প্যাশন অব জিসাস ক্রাইস্ট' প্রথম প্রদর্শিত

হয় ১৯০২ সালে। পরে এটির পরিবর্ধন ঘটিয়ে পুনরায় প্রদর্শিত হয় ১৯০৫-এ। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ছবিতে প্রিন্টগুলি ছিল বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। প্রতিটি ফ্রেম আলাদা করে হাতে রং করা হয়েছিল। রঙের কিছু বিশেষত্বও দেখা গিয়েছিল। যেমন, রাতের দৃশ্য বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছিল নীল রং। দাদাসাহেব ফালকের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার বা জীবনী থেকে জানা যায় তিনি এই ছবিটি দেখেছিলেন মুম্বাইয়ে স্যান্ডহার্স্ট রোডের আমেরিকা-ইন্ডিয়া সিনেমায় ১৯১০-এর বড়োদিনের সময়ে এক শনিবার। কিন্তু ছবিটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় ছবিটি মুম্বাই শহরে প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯১১-র ইস্টারের সময়ে।

৫৩ **লেডি টিচার** এই নামে আলাদা ছবি হয়নি। 'ইন্দ্রজিৎ ও লেডি টিচার' ছবির নামের শেষাংশ। 'ইন্দ্রজিৎ' দ্রষ্টব্য।

৫৪ **শিবরাত্রি** প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তৈরি ছয় রিলের এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন প্রদোষ বসু, গোপাল দাস, কুসুমকুমারী, বসন্তকুমারী, ইতালিয়ান অভিনেতা শ্রী পি. ম্যানেল্লি এবং শ্রীমতী এফ. ম্যানেল্লি। ছবিটি কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে ১৯২১-এর জানুয়ারি মাসে প্রথম প্রদর্শিত হয়।

৫৫ **সতী বা দক্ষযজ্ঞ** 'সতী' ছবিটির ইংরেজি নামকরণ হয়েছিল 'The Story of Daksha Jagya'। ১৯২২-এর আটই জুলাই ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে এটি প্রথম প্রদর্শিত হয়। পাঁচ রিলের ছবিটিতে পেসেন্স কুপার অভিনয় করেছিলেন।

৫৬ **সাধু বা শয়তান** আসল নাম 'সাধু কী শয়তান'। ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানির এই ছবিটির পরিচালনা এবং কাহিনি নীতীশ

লাহিড়ীর। অভিনয়ে ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মন্মথ পাল, শিশুবালা, লিনা ভ্যালেনটাইন প্রমুখ।

৫৭ **সাবিত্রী** ১৯২৪ সালের 'নাচঘর' পত্রিকায় 'সাবিত্রী'কে 'বিদেশীদের তোলা হিন্দু পুরাণের প্রথম ছবি' বলা হয়েছিল। ছবিটি ইতালিতে তৈরি বলে জানা যায়। এর পরিচালক বা নাট্যাধ্যক্ষ ছিলেন মি. অ্যামব্রোসিয়ো। 'সাবিত্রী'র নামভূমিকায় অভিনয় করেন কাউন্টেস রিনা দি লিগুয়োরো।

৫৮ **হরিশ্চন্দ্র** ছবিটির সম্পূর্ণ নাম 'সত্যবাদী রাজা হরিশ্চন্দ্র'। 'এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ' কোম্পানির তত্ত্বাবধানে নির্মিত ছবিটির বিষয় পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্রের জীবন। নামভূমিকায় অভিনয় করেন ভারতীয় মঞ্চের 'আরভিং' নামে খ্যাত হরমুসজি তন্ত্র। নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন মিস সাভারিয়া। ছবিটির ইংরেজি বিজ্ঞাপনে 'দ্য লাইফ অব আ হিন্দু কিং' বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। এটি ১৯১৭-এ মুক্তি পায়। কিন্তু দাদাসাহেব ফালকে পরিচালিত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' বাণিজ্যিকভাবে প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯১৩-র তেরোই মে তারিখে। এই ছবিতে নায়িকা তারামতীর ভূমিকায় অভিনয় করেন পুরুষ অভিনেতা এ. সালুঙ্কে।

৫৯ **হাতেমতাই** 'হাতেমতাই' মুক্তি পায় ১৯২৯-এ। আরব্য রজনীর গল্পের হাতিম এবং পরি গুলনার-এর কাণ্ড-কারখানার কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে অভিনয় করেন রামপিয়ারী, এ. আর. পহেলবান, গুলাব, হায়দরশা প্রমুখ অভিনেতারা।

চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব

১ অনাদি বসু (১৮৮৪-১৯৪৬) ১৯১১ সালে দেবী ঘোষের সহায়তায় অরোরা সিনেমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন অনাদিবাবু। প্রথমদিকে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে 'চলন্ত ছবি' বা 'ম্যুভি' দেখাতেন। রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটে ছিল তাঁদের ল্যাবরেটরি এবং স্টুডিয়ো। হীরালাল সেনের দুটি ক্যামেরা বন্ধক রাখা ছিল জনৈক পান্না ওরফে আংটি মল্লিকের কাছে। সেগুলি অনাদি বসু কিনে নিয়ে নিজে ছবি তুলতে শুরু করেন। এ ছাড়া বিদেশি ছবি দেখানো তো ছিলই। ম্যাডান কোম্পানির 'বিল্বমঙ্গল' প্রযোজনার ক-দিনের মধ্যেই অরোরার 'রত্নাকর' ছবি মুক্তি পায়। তার কয়েক বছরের মধ্যেই বিদেশি নিউজ রিলের অনুপ্রেরণায় সংবাদচিত্র তুলতে শুরু করেন অনাদি বসু। তাঁর নাম দেওয়া হয় 'অরোরা সাময়িকী' বা 'অরোরা টুকিটাকি'। ১৯২৯-এ অনাদি বসু প্রতিষ্ঠা করেন অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের। ১৯৪৫ সালে এই সংস্থা সমিতিবদ্ধ হলে, অনাদি বসু তাঁর প্রথম ম্যানেজিং (১৮৯৩-১৯৭৮) ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৩৭-এ গঠিত বেঙ্গল মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন তিনি।

২ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) ডাক্তারির ছাত্র অমৃতলাল কিছুদিন শিক্ষকতা এবং কিছুদিন ডাক্তারি করেছিলেন। পুলিশ বিভাগেও চাকরি করেন কিছুদিন। মূলত মঞ্চাভিনেতা অমৃতলালের ছায়াছবিতে অভিনয় একেবারেই নগণ্য। অভিনয় করেছেন ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানি, বেঙ্গল থিয়েটার,

মিনার্ভা, স্টার প্রভৃতি মঞ্চে। নাট্যকার হিসেবেও সমান প্রসিদ্ধ অমৃতলাল নাটক নির্দেশনা করতেন এবং নাট্যশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। 'তিলতর্পণ', 'ব্যাপিকা বিদায়', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'তরুবালা', 'খাসদখল' প্রভৃতি তাঁর রচিত বিখ্যাত নাটক। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। সরস রচনা, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতির জন্য তাঁকে রসরাজ বলা হতো। এ ছাড়া তাঁর ছদ্মনামে ছিল 'ভাঁড়ু দত্ত' 'অ্যান অ্যাক্টর', 'কবিরঞ্জন গ্যাংগার্জী'। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী অমৃতলাল যুক্ত ছিলেন রাজনীতি এবং সমাজসেবার সঙ্গেও। সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। যুক্ত ছিলেন কয়েকটি স্কুলের সঙ্গেও। প্রিন্স অব ওয়েলস কলকাতায় আসলে, উকিল জগদানন্দর বাড়িতে ইংরেজ-তোষণের বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচনার জন্য আদালত তাঁকে দণ্ড দেয়। এই ঘটনার সূত্র ধরেই প্রণীত হয় ১৮৭৬-এর মঞ্চাভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন।

৩ **অহীন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪)** থিয়েটার, নাটক প্রভৃতির আকর্ষণে পড়াশোনা ছেড়ে দেন কিশোর বয়সে। মঞ্চে আবির্ভাব ১৯২৩ সালে 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে অর্জুনের ভূমিকায়। এ ছাড়া 'অশোক' 'শাজাহান', 'মিশরকুমারী', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'চাঁদসদাগর', 'সিরাজদৌল্লা' প্রভৃতি নাটকে তাঁর অভিনয় বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯২২-এ নিজস্ব পরিচালনায় 'সোল অব আ স্লেভ' বা 'বাঁদির প্রাণ' ছবিতে তাঁর চলচ্চিত্রজগতে আত্মপ্রকাশ ঘটে। নিজের প্রতিষ্ঠা করা ছায়াছবি প্রযোজক সংস্থা ফোটো প্লে সিন্ডিকেট অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। পরে ম্যাডান কোম্পানি ও অন্যান্য কোম্পানির শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেন। পশ্চিমবঙ্গ সংগীত নাটক আকাদেমির অধ্যক্ষ নিযুক্ত

হয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে। ছায়াছবিতে শেষ অভিনয় করেন ১৯৫৪ সালে এবং শেষ মঞ্চাভিনয় করেন ১৯৫৭ সালে মিনার্ভায় 'শাজাহান' নাটকে নামভূমিকায়। ছায়াছবি বা মঞ্চজগতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'নটসূর্য' নামে।

৪ **আগা হিসার কাশ্মীরি (১৮৭৯-১৯৩৫)** উর্দু এবং হিন্দি ভাষার চিত্রনাট্যকার প্রথমে কাজ করতেন পারসি থিয়েটারে। পরে মুম্বাইয়ের অ্যালফ্রেড থিয়েটারের সঙ্গে এবং আরও পরে ম্যাডান কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। শেক্সপিয়রের বিভিন্ন নাটকের হিন্দি অনুকরণ করতেন। সবাক চলচ্চিত্রের যুগে বেশ কিছু ছবির সংগীতের কথা রচনা করেন আগা হিসার।

৫ **আব্দুল করিম খাঁ (১৮৭২-১৯৩৭)** কিরণ সংগীত ঘরানার এক বিদগ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এই কণ্ঠ ও সারেঙ্গিশিল্পী। বীণা, সেতার এবং তবলা বাদনেও সমান পারদর্শী ছিলেন। মহীশূরের রাজদরবারে আমন্ত্রিত হয়ে কর্নাটকি সংগীতের বিশেষ সংস্পর্শে আসেন আব্দুল করিম খাঁ। সওয়াই গন্ধর্ব এবং সুরশ্রী কেশরবাঈ কেরকরের মতো সংগীতশিল্পীরা ছিলেন তাঁর শিষ্য।

৬ **আর্দেশির ইরানি (১৮৮৬-১৯৬৯)** পুণা শহরের জরথ্রুস্টিয়ান-পারসি পরিবারে জন্মগ্রহণ করা খান বাহাদুর আর্দেশির ইরানি ছিলেন একাধারে লেখক, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিবেশক, প্রদর্শক এবং সিনেম্যাটোগ্রাফার। আমেরিকার ইউনিভার্সাল স্টুডিয়োর ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন আর্দেশির। ১৯২০ সালে তাঁর

প্রযোজিত প্রথম ছবি নলদময়ন্তী মুক্তি পায়। ১৯২২-এ ভোগীলাল দাভের সঙ্গে 'স্টার ফিল্মস' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪-এ স্থাপন করেন নতুন সংস্থা ম্যাজেস্টিক ফিল্মস। ১৯২৫-এ স্থাপিত ইম্পিরিয়াল ফিল্মস কোম্পানির হয়ে তিনি মোট বাষট্টিটি ছবি নির্মাণ করেন। ১৯৩১-এ মুক্তি পায় তাঁর তৈরি প্রথম ভারতীয় সবাক চলচ্চিত্র 'আলম আরা'। ভারতে তৈরি প্রথম রঙিন ছবি 'কিষানকন্যা' আর্দেশির ইরানি নির্দেশিত। হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান, পারসিয়ান, ইন্দোনেশীয় এবং তামিল ভাষায় ছবি তৈরি করেছেন তিনি।

৭ **আল্লাদিয়া খাঁ (১৮৫৫-১৯৪৬)** গানসম্রাট নামে পরিচিত এই উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী আগ্রা ঘরানার ওপর আশ্রিত জয়পুর-আতরাউলি সংগীত ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম রাজস্থানে, কিন্তু অল্প বয়সেই কোলহাপুর শহরে চলে এসেছিলেন। নাট কামোদ, নাট বিলাওয়াল, বাসন্তী কেদার, ভূপেশ্বরী প্রভৃতি রাগ সৃষ্টি এবং পুনরুদ্ধার এই সংগীতশিল্পীর বিশেষ কৃতিত্ব।

৮ **এণাক্ষী রমা রাও** শ্রীযুক্ত ভাওনানির স্ত্রী এণাক্ষী রমা রাও 'দ্য থ্রো অব আ ডাইস' বা 'প্রপঞ্চপাশ' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেননি। করেছিলেন সীতা দেবী।

৯ **স্যার এডুইন আর্নলড (১৮৩২-১৯০৪)** সাসেক্সের এক ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বিতীয় সন্তান স্যার এডুইন ছিলেন কবি এবং সাংবাদিক। রচেস্টারের কিংস স্কুল, লন্ডনের কিংস কলেজ এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। ডেইলি টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রের সঙ্গে বহু বছর যুক্ত ছিলেন। আফ্রিকার কঙ্গো নদীর উৎস সন্ধানে এইচ. এম.

স্ট্যানলির অভিযানের ব্যবস্থা করেছিলেন ডেইলি টেলিগ্রাফ এবং নিউইয়র্ক হেরাল্ড সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে। তার প্রতিদান-স্বরূপ মি. স্ট্যানলি ওই অঞ্চলের একটি পাহাড়ের নামকরণ করেন স্যার এডুইনের নামে। 'লাইট অব এশিয়া' ছাড়া তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্যের মধ্যে 'ইন্ডিয়ান সং অব সংস' (১৮৭৫), 'পার্লস অব ফেথ' (১৮৮৩), 'দ্য সং সেলেস্টিয়েল' (১৮৮৫), 'উইথ সাদি ইন দ্য গার্ডেন' (১৮৮৮) প্রভৃতি বিখ্যাত। ভারতবর্ষে অনাগরিক ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যের মধ্যে স্যার এডুইন অন্যতম।

১০ ওগিলভি সাহেব লেফটেন্যান্ট কর্নেল জর্জ ড্রুমন্ড ওগিলভি (১৮৮২-১৯৬৬)। রাজপুতানায় ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট জেনারেল ছিলেন ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত।

১১ ওস্টেন সাহেব (১৮৭৬-১৯৫৬) জার্মান চলচ্চিত্রনির্মাতা ফ্রানজ ওস্টেন-এর আসল নাম ফ্রানজ ওস্টারমায়ার। বম্বে টকিজের হয়ে তিনি 'অচ্ছুৎ কন্যা' বা 'জীবন নাইয়া'র মতো সাড়া জাগানো ছবি পরিচালনা করেন। তিনি 'লাইট অব এশিয়া' ছাড়া নির্বাক ছবি 'সিরাজ' এবং 'প্রপঞ্চপাশ' (থ্রো অব ডাইস)-এর পরিচালক।

১২ কার্ক ডগলাস রাশিয়া থেকে দেশান্তরি হয়ে আমেরিকায় চলে আসা ইহুদি পিতা-মাতার সন্তান কার্ক ডগলাসের আসল নাম ইশার দানিয়েলোভিচ। জন্ম ১৯১৬-র ৯ ডিসেম্বর। নিউইয়র্কের আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব ড্রামাটিক আর্টস-এর স্কলারশিপ পেয়েছিলেন কার্ক। সেখানেই তাঁর অভিনয়প্রতিভা অন্যদের নজরে আসে। প্রথম পেশাদারি অভিনয় শুরু ব্রডওয়েতে। কার্ক ডগলাস নির্বাক ছায়াছবিতে কখনও

অভিনয় করেননি। তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি 'দ্য স্ট্রেঞ্জ লাভ অব মার্থা আইভার্স' (১৯৪৬)। হলিউডের 'টাফ গাই' হিসেবে পরিচিত কার্ক ডগলাস অভিনীত বহু ছবির মধ্যে 'চ্যাম্পিয়ন' (১৯৪৯), 'অ্যালং দ্য গ্রেই-ডিভাইড' (১৯৫১), '২০০০ লিগস আন্ডার দ্য সি' (১৯৪৫), 'ইউলিসিস' (১৯৫৫), 'লাস্ট ফর লাইফ' (১৯৫৬), 'লাস্ট ট্রেন ফ্রম গানহিল' (১৯৫৯), 'দ্য ডেভিল'স ডিসাইপল' (১৯৫৯), 'স্পার্টাকাস' (১৯৬০), 'ইজ প্যারিস বার্নিং?' (১৯৬৬), 'ওয়ান্স ইজ নট এনাফ' (১৯৭৫) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৩ **কারণ্ডিকার** এস. এল. পাটনকার এবং দিভেকারের সঙ্গে ১৯১২ সালে মুম্বাই করোনেশন সিনেমায় চাকরি করতেন কারণ্ডিকার। এঁরা তিন বন্ধু এবং রানাডে, ভাতখণ্ডে নামে আরও দুজন ১৯১৪-এ 'সত্যবান সাবিত্রী' ছবি তৈরি করেন। এঁরা ১৯১৫ সালে প্রযোজনা করেন 'প্যাশন ভার্সাস লার্নিং' এবং 'মার্ডার অব নারায়ণরাও পেশোয়া'।

১৪ **ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)** প্রখ্যাত নাট্যকার, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। রসায়নে এম. এ.। প্রথম জীবনে অধ্যাপনা করতেন। সাহিত্যচর্চা শুরু করেন ছাত্রজীবনে। প্রথম মঞ্চসফল নাটক 'আলিবাবা'। ঐতিহাসিক এবং দেশাত্মবোধক নাটক 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর', 'রঘুবীর' এবং 'নন্দকুমার' বিখ্যাত হয়েছিল। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা আটান্ন। 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' অনুবাদ করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যনাটক 'ফুলশয্যা' উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। 'অলৌকিক রহস্য' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বেশ কয়েক বছর।

১৫ গোবিন্দরাও তাম্বে (১৮৮১-১৯৫৫) মারাঠি নাট্যসংগীতের স্থপতি গোবিন্দরাও তাম্বে, ভাস্করবুয়া বাখালের শিষ্য হলেও নিজের পরিচয় দিতেন আল্লাদিয়া খাঁ-র ছাত্র হিসেবে। কিন্তু খাঁ সাহেবের কাছে তিনি কখনও সরাসরি তালিম নেননি। ১৯১০-এ 'মনাপমন' নাটকে সংগীত প্রয়োগ করেন বিখ্যাত হারমোনিয়ামবাদক, সংগীতস্রষ্টা এবং অভিনেতা তাম্বে। ১৯৩২-এ মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম মারাঠি সবাক ছবি 'অযোধ্যাচে রাজা'র সুরকার ছিলেন তিনি।

১৬ গ্রিফিথ (১৮৭৫-১৯৪৮) ডেভিড লাভলিন ওয়ার্ক গ্রিফিথ সংক্ষেপে ডি. ডবল্যু. গ্রিফিথ আমেরিকার এক পথিকৃৎ চিত্র পরিচালক। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন 'দ্য বার্থ অব আ নেশন' (১৯১৫) এবং 'ইনটলারেন্স' (১৯১৬) ছবিদুটির জন্য। এই দুটি ছাড়া আরও বহু চলচ্চিত্রের নির্মাতা গ্রিফিথকে চার্লি চ্যাপলিন বলতেন, 'আমাদের সকলের শিক্ষক'। চ্যাপলিন, মেরি পিকফোর্ডস, ডগলা ফেয়ারব্যাঙ্কস প্রমুখের সঙ্গে ইউনাইটেড আর্টিস্টস সংস্থা গঠন করেন।

১৭ গ্রেটা গার্বো (১৯০৫-১৯৫৫) সুইডিশ অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বোর জন্ম স্টকহোম শহরে। আসল নাম গ্রেটা লোভিসা গুস্তাভসন। দেশ ছেড়ে অভিনয়ের জন্য পাকাপাকিভাবে আমেরিকার হলিউডে চলে আসা গ্রেটা গার্বো বিখ্যাত হয়ে আছেন নির্বাক যুগের ছবিতে এবং তার পরবর্তী হলিউডের স্বর্ণযুগের ছায়াছবির সুন্দরী নায়িকা হিসেবে। হলিউডে গ্রেটার প্রথম ছবি 'দ্য টরেন্ট' (১৯২৫)। এ ছাড়া 'দ্য টেম্পট্রেস', 'ফ্লেশ অ্যান্ড দ্য ডেভিল', 'লাভ', 'দ্য মিস্টিরিয়াস লেডি', 'দ্য কিস' প্রভৃতি নির্বাক ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। গ্রেটা গার্বোর

প্রথম ছবি সবাক 'আনা ক্রিস্টি'র (১৯৩০) বিজ্ঞাপনে 'গ্রেটা টকস!' স্লোগান ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্যান্য সবাক ছবির মধ্যে বিখ্যাত হল 'মাতাহারি' (১৯৩৩) 'গ্র্যান্ড হোটেল' (১৯৩২), 'কুইন ক্রিস্টিনা' (১৯৩৩) প্রভৃতি। গ্রেটা গার্বো অভিনয় করেছেন মাত্র সাতাশটি ছবিতে। ১৯৪১-এর 'টু ফেসড উম্যান' তাঁর শেষ ছবি। এরপর তিনি নিউইয়র্কে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।

১৮ **ঘনশ্যামদাস চোখানি** কলকাতা নিবাসী মাড়োয়ারি ব্যাবসাদার ঘনশ্যামদাস চোখানি চলচ্চিত্র প্রযোজনার ব্যবসায়ে এসেছিলেন ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টসে অর্থ লগ্নি করে। এই ব্যবসায়ে আসতে তাঁর বুদ্ধিদাতা এবং মদতদার ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বা ডি জি। এর আগে অবশ্য ঘনশ্যামদাস মিনার্ভা থিয়েটারে টাকা খাটাতেন। ঘনশ্যামদাস এবং ডি জি-র ইচ্ছে ছিল তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ছবি করবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে দু-হাজার টাকায় ওই উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব কেনার রফা হয়েছিল। কিন্তু কোনোভাবে খবর পেয়ে ম্যাডান কোম্পানি আগেভাগেই বাইশ হাজার টাকায় বঙ্কিমচন্দ্রের সব কটি উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব নিয়ে নেন। তার ফলে তাঁরা গিরিশ ঘোষের 'শঙ্করাচার্য' নাটকটি কিনে, সেটি নিয়ে ছবি করেন।

১৯ **চারুচন্দ্র রায় (১৮৯০-১৯৭১)** ছোটোবেলা থেকে চিত্রকলায় পারদর্শী চারু রায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস.সি. পরীক্ষায় পাশ করে যুক্ত হন ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর সঙ্গে। কিছুদিন বিভিন্ন দৈনিকে ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন। কাজ করেছেন

আনন্দবাজার পত্রিকায় নাটকের সঙ্গে যোগাযোগ মঞ্চসজ্জার কাজ করতে গিয়ে। প্রথম শিল্পনির্দেশনা 'মুক্তার মুক্তি' নাটকে। হিমাংশু রায়ের আমন্ত্রণে 'লাইট অব এশিয়া' ছবির শিল্পনির্দেশক হন। পরের পরিচালনা 'দ্য লাভ অব আ মুঘল প্রিন্স' ছবিতে। এ ছাড়াও কয়েকটি সবাক ও নির্বাক ছবি 'সিরাজ'-এ শিল্পনির্দেশনার সঙ্গে অভিনয়ও করেন। প্রথম চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন। নিউ থিয়েটার্সের প্রতীক হাতিটি চারু রায়ের সৃষ্টি। চারু রায়ের স্ত্রী মায়া রায় অভিনয়জগতে আসেন এবং নায়িকার ভূমিকায় সফল অভিনয় করেন চারু রায়েরই উৎসাহে। বাংলা ভাষার প্রথম সিনেমা বিষয়ক পত্রিকা 'বায়োস্কোপ'-এর সম্পাদক ছিলেন চারু রায়।

২০ **চিত্তরঞ্জন গোস্বামী** কাহিনিকার পরিচালক তথা কৌতুকাভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর জন্ম ১২৮৮ বঙ্গাব্দে নদীয়ার শান্তিপুরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর পাকুড় এস্টেট এবং ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে কিছুদিন কাজ করেন। তারপর আসেন অভিনয়জগতে। অভিনেতা হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি 'বিয়ের বাজার' (১৯২২) বা 'ম্যারেজ মার্কেট'। কোনোরকম মেক-আপ ছাড়া মুখে বাহান্ন রকমের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন চিত্তরঞ্জন। বিভিন্ন মঞ্চে একাধিক নাটকেও তিনি অভিনয় করেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে এই অভিনেতার মৃত্যু হয়।

২১ **চার্লি চ্যাপলিন (১৮৮৯-১৯৭৭)** স্যার চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন জন্মসূত্রে ইংরেজ। একেবারে শিশুবয়সে অভিনয় শুরু করে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত নানা কাজ,

বিভিন্ন মঞ্চাভিনয়, ভ্রাম্যমাণ অভিনেতা প্রভৃতিতে রত থাকবার পর ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকা পৌঁছোন। সেখানে আরও বছর চারেক ফিল্ম স্টুডিয়োগুলিতে বিভিন্ন কাজ করে পেট চালাতে হয় তাঁকে। অবশেষে ১৯১৪-এ সৃষ্টি হয় কমিক চিত্র 'দ্য ট্র্যাম্প'-এর। এই চরিত্রই চার্লসকে দিয়েছে খ্যাতি, অর্থ, যশ, সম্মান— সব কিছু। এই চরিত্ররূপেই অমর হয়ে আছেন চ্যাপলিন। ইউনাইটেড আর্টিস্টস এবং মোশন পিকচার অ্যাকাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চ্যাপলিন 'ট্র্যাম্প' ছাড়া অন্য চরিত্রেও অভিনয় করেন। তার মধ্যে সবাক ছবি 'মঁসিয়ে ভের্দু', 'লাইম লাইট', 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ট্র্যাম্প'-এর ভূমিকা সংবলিত বেশ কয়েকটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের নির্বাক ছবি, যেমন 'গোল্ড রাশ', 'দ্য কিড', 'সিটি লাইটস', 'মডার্ন টাইম', 'সার্কাস' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে আমেরিকান সরকার তাঁকে আমেরিকাবিরোধী তকমা দিলে, তিনি আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য হন এবং সুইজারল্যান্ডের ভেভে শহরে বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রযোজক, চিত্রনাট্য ও কাহিনি রচয়িতা, নির্দেশক, অভিনেতা, সিনেম্যাটোগ্রাফার, সুর রচয়িতা, সংগীত রচয়িতা ইত্যাদি। জীবনের শেষ দুটি ছবি 'আ কিং ইন নিউইয়র্ক' (১৯৫৭) এবং 'আ কাউন্টেস ফ্রম হংকং' (১৯৬৭) তিনি ইংল্যান্ডে নির্মাণ করেন।

২২ জুবেদা (১৯১১-১৯৫৫) জুবেইদা বেগম ধনরাজগীর-এর জন্ম গুজরাতের সুরাট শহরে। পিতা হলেন শচীনের নবাব এবং মা ফতেমা বেগম। ফতেমা পরবর্তী যুগে দেশের প্রথম মহিলা চলচ্চিত্র পরিচালক হন। মাত্র বারো বছর বয়সে অভিনয় করতে শুরু করেন জুবেইদা।

ভারতের প্রথম সবাক কাহিনিচিত্র 'আলম আরা'য় (১৯৩১) নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর আগে বেশ কয়েকটি নির্বাক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন। তাঁর দুই বোন শাহজাদী এবং সুলতানাও ছিলেন অভিনেত্রী। হায়দ্রাবাদের মহারাজা নরসিং ধনরাজগীর জ্ঞান বাহাদুরকে বিবাহ করে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন জুবেইদা। তাঁর অভিনীত নির্বাক ছবিগুলির মধ্যে 'বীর অভিমন্যু', 'কালা চোর', 'দেবদাসী', 'দেশ কা দুশমন', 'বুলবুল-এ ফরিস্তা', 'লায়লা মজনু', 'বলিদান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২৩ জে. এফ. মদন (১৮৫৬-১৯২৩) জামশেদজি ফ্রামজি ম্যাডান জন্মগ্রহণ করেন মুম্বাইয়ে এক পারসি পরিবারে। মুম্বাইয়ের এলফিনস্টোন ড্রামাটিক ক্লাবের সামান্য চাকরি ছেড়ে করাচি চলে গিয়ে কিছুদিন ব্যাবসা চালানোর পর ১৮৮৩ সালে আসেন কলকাতায়। মিলিটারিতে বিভিন্ন সরবরাহের ব্যবসায় পয়সা জমিয়ে কোরিন্থিয়ান থিয়েটার কিনে নেন। তারপরে কেনেন এলফিনস্টোন থিয়েটার কোম্পানি। ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে সিনেমা দেখানো শুরু করেন ১৯০২ সাল থেকে। ১৯০৭-এ ধর্মতলায় এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বাংলা কাহিনিচিত্র বিল্বমঙ্গল প্রযোজনা করেন ১৯১৯-এ। সিনেমার ব্যাবসা ছাড়া বিদেশি মদ আমদানি, ওষুধ, খাদ্যদ্রব্য, ভূ-সম্পত্তি, বীমা প্রভৃতির সফল ব্যবসায়ী ছিলেন ম্যাডান।

২৪ জ্যোৎস্না গুপ্ত হীরালাল সেন-এর ভাগ্নে তথা সহকর্মী এবং লন্ডন বায়োস্কোপ কোম্পানির অংশীদার কুমারশঙ্কর গুপ্তের কন্যা

জ্যোৎস্না গুপ্ত। জন্ম ১৯১৪ সালে। সিনেমায় আত্মপ্রকাশ নির্বাক ছবি 'চোরকাঁটা'য়। পরের ছবি 'চাষার মেয়ে'। কালী ফিল্মস-এর প্রথম সবাক ছবি 'তরুণী'তে (১৯৩৪) নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর অভিনয় করেন 'বিদ্রোহী', 'পথের শেষে', 'পরশমণি', 'অভিসার', 'মাটির ঘর' প্রভৃতি বহু সবাক ছবিতে।

২৫ **জ্যোতিষচন্দ্র সরকার** প্যাথে কোম্পানির ক্যামেরাম্যান ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র। ম্যাডান কোম্পানির ডাকে যোগ দিলেন সেখানে। তিনিই বাংলা দেশের প্রথম ক্যামেরাম্যান। সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত সফরের সময়ে তিনি সম্রাটের প্রজেক্টর অপারেটর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ম্যাডান কোম্পানির জ্যোতিষ সরকার বাঙালির সংস্থা, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানিতে যোগ দেন। একসময়ে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখার জন্য তিনি সিনেমা মহলে 'চাচা' নামে পরিচিত হতেন।

২৬ **ডি. জি. ফড়কে (১৮৭০-১৯৪৪)** ধুন্ধিরাজ গোবিন্দ ফালকে সমধিক পরিচিত ছিলেন দাদাসাহেব ফালকে নামে। ভারতবর্ষের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'-সহ মোট পঁচানব্বইটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের এবং ছাব্বিশটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছায়াছবির নির্মাতা ফালকে ছিলেন একাধারে প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রনাট্য রচয়িতা এবং আরও অনেক কিছু। ভারতীয় সিনেমাজগতের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার তাঁর নামেই প্রচলিত। নাসিকের অদূরে ত্র্যম্বকেশ্বরে জন্ম দাদাসাহেবের। মুম্বাইয়ের স্যার জে. জে. স্কুল অব আর্ট-এর ছাত্র ছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রথম প্রদর্শিত হওয়ার বছর খানেক আগে রামচন্দ্র গোপাল তোর্ণে নামক

একজন 'পুণ্ডলিক' নাটকের ম্যুভি তোলেন। কিন্তু সেটিকে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমার মর্যাদা স্বাভাবিক কারণেই দেওয়া হয়নি। ফালকে নির্মিত অন্যান্য সিনেমার মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম', 'কালীয়মর্দন', 'সেতুবন্ধন', 'গঙ্গাবতরণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২৭ **দিবেকার** ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ের করোনেশন সিনেমায় এস. এন. পাটনকার এবং কারণ্ডিকারের সহকর্মী ছিলেন দিবেকার। এই তিন বন্ধু এবং রানাডে ও ভাতখণ্ডে একত্র হয়ে 'পাটনকার ইউনিয়ন' নামক সংস্থা গড়ে তোলেন।

২৮ **দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৪৩)** পোশাকি নাম দুর্গাচরণ বদলে দুর্গাদাস করেছিলেন গুরুজনের নজর এড়িয়ে অভিনয়জগতে আসবার জন্য। নাটক এবং অভিনয়ের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল কিশোরবয়স থেকে। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে চিত্রাঙ্কন শেখেন। সেই থেকে ম্যাডান থিয়েটারে 'টাইটেল' লেখার কাজ পান। সেখানেই আলাপ নরেশ মিত্র, শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখের সঙ্গে। তাঁরা 'চন্দ্রনাথ' (১৯২৪) ছবিতে নায়ক নির্বাচিত করেন দুর্গাদাসকে। এরপর প্রেমাঞ্জলি, মিশররাণী, ধর্মপত্নী, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি বহু নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেন দুর্গাদাস। সেইসঙ্গে শুরু হয় মঞ্চাভিনয়। অনেকগুলি সবাক ছবিতেও দুর্গাদাস অভিনয় করেছেন।

২৯ **দেবিকারাণী (১৯০৮-১৯৫৫)** জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের আত্মীয় দেবিকারাণীর পড়াশোনা এবং নাট্য বিষয়ে পড়াশোনা ইংল্যান্ডে। ১৯২৯-এ পরিচালক এবং অভিনেতা হিমাংশু রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় দেবিকার। ১৯৩৩-এ 'কর্মা' ছবিটিতে অভিনয় করেন তাঁরা।

সেই ছবিতে চার মিনিটের একটি চুম্বনদৃশ্য সে-কালে যথেষ্ট বিতর্কের উপাদান হয়েছিল। ১৯৩৬-এ অশোককুমারের বিপরীতে 'অচ্ছুৎ কন্যা' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে জনপ্রিয় হবার পর অভিনেতা নাজমুল হাসানের সঙ্গে চলে গেলেও আবার ফিরে আসেন হিমাংশু রায়ের কাছে। ১৯৪০-এ হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পর বম্বে টকিজ-এর রমরমা কমে গেলে ১৯৪৫-এ রুশি চিত্রকর স্বেতস্লাভ রোয়েরিক-কে বিবাহ করেন দেবিকা এবং অভিনয় থেকে বিদায় নেন। ১৯৫৮-এ পদ্মশ্রী খেতাবে এবং ১৯৭০-এ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। অভিনীত অন্যান্য ছবির মধ্যে 'জওয়ানি কী হাওয়া' (১৯৩৫), 'জন্মভূমি' (১৯৩৬), 'জীবন নাইয়া' (১৯৩৬), 'জীবন দুর্গা' (১৯৩৯), 'আনজান' (১৯৪১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩০ **ধাইবার** ভি. শান্তারামের বন্ধু এবং প্রভাত ফিল্ম কোম্পানির অংশীদার ধাইবার-এর সম্পূর্ণ নাম কেশবরাও ধাইবার।

৩১ **ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়** চলচ্চিত্রমহলে ডি. জি. নামে পরিচিত ধীরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ছিলেন চিত্রশিল্পী। চলচ্চিত্রে আগমন চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে। নীতীশ লাহিড়ীর সঙ্গে ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি গঠন করেন। ধীরেন্দ্রনাথ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় এবং পরিচালনা করতেন। 'বিলেত ফেরৎ', 'সাধু কি শয়তান', 'যশোদানন্দন' প্রভৃতি ছবি করবার পর হায়দ্রাবাদ গিয়ে লোটাস ফিল্ম কোম্পানি স্থাপন করে ছবি নির্মাণ করতে শুরু করেন। সেখানে স্টুডিয়ো, প্রেক্ষাগৃহ গড়ে কোম্পানি যখন বড়ো হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে কোনো ছবিতে ধর্মীয় বিতর্ক প্রদর্শিত করে হায়দ্রাবাদের

শাসক নিজামের বিরাগভাজন হয়ে ব্যাবসা গুটিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন। কলকাতায় এসে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্ম কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২৮-এ। তারপর একে একে নিউ থিয়েটার্স, ইস্ট-ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানি প্রভৃতির হয়ে ছবি করেন। কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, নির্দেশক, সংগঠক, প্রযোজক, অভিনেতা ডি. জি. পদ্মভূষণ (১৯৭৪) এবং দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (১৯৭৬) দ্বারা সম্মানিত হন। তাঁর স্ত্রী প্রেমিকা ওরফে রমলা দেবী এবং দুই কন্যা পারুল ও মণিকাকে অভিনয়জগতে আনেন তিনি।

৩২ নরেশচন্দ্র মিত্র (১৮৮৮-১৯৬৮) আইনের স্নাতক নরেশ মিত্র আইন ব্যাবসা, পাটের দালালি প্রভৃতি ছেড়ে যোগ দেন পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে। ১৯২০ সালে মিনার্ভায় 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পরবর্তী জীবনে 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে শকুনি, 'কেদার রায়'-এ শ্রীমন্ত, 'চাণক্য'-তে কাত্যায়নে, 'শাজাহান'-এ দিলদার চরিত্রগুলি প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯২১-এ তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির হয়ে 'আঁধারে আলো', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'নৌকাডুবি', 'মানভঞ্জন' প্রভৃতি নির্বাক ছবিতে অভিনয় এবং কিছু ছবি পরিচালনা করেন। বেশ কিছু সবাক ছবিতেও তিনি ছিলেন পরিচালক এবং অভিনেতা। যুক্ত ছিলেন যাত্রাজগতের সঙ্গেও। আশি বছর বয়সে মৃত্যুর তিন দিন আগেও 'সোনাই দীঘি' এবং 'বাঙালী' নামে দুটি যাত্রা-নাটকে তিনি অভিনয় করেন।

৩৩ নিরঞ্জন পাল (১৮৮৯-১৯৫৯) নিরঞ্জন পাল ছিলেন অভিনয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট। দেশে

থাকলে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করতে পারে এই ভেবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে দুরে, বিলেতে পাঠিয়েছিলেন বাবা বিপিনচন্দ্র পাল। কিন্তু সেখানেও বিনায়ক দামোদর সাভারকর এবং মদনলাল ধিংড়ার মতো বিপ্লবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় নিরঞ্জন পালের। সেই সময়ে নাট্য রচনা এবং ছায়াছবির চিত্রনাট্য তৈরির দিকেও ঝুঁকে পড়েন তিনি। 'লাইট অব এশিয়া' এবং 'সিরাজ'-এর সাফল্যের পর ইংরেজ স্ত্রী লিলি এবং পুত্র কলিনকে নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। যুক্ত হয়ে পড়েন বম্বে টকিজের সঙ্গে। পরিচালনা করেন 'নিডুল'স আই' (১৯৩১), 'পরদেশীয়া' (১৯৩২), 'চিঠি' (১৯৪১) প্রভৃতি ছবি। 'অচ্ছুৎ কন্যা' (১৯৩৬), 'জীবন নাইয়া' (১৯৩৬) এবং 'জওয়ানি কী হাওয়া' (১৯৪১)-র মতো জনপ্রিয় হিন্দি ছবির চিত্রনাট্য নিরঞ্জন পালের রচনা।

৩৪ **নির্মলচন্দ্র চন্দ (১৮৮৮-১৯৫৩)** প্রখ্যাত দেশসেবক। হাইকোর্টে ওকালতি দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে পৈত্রিক ফার্ম জি. সি. চন্দ অ্যান্ড কোম্পানিতে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অন্যতম সহকারী ছিলেন। যুক্ত ছিলেন বহু শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে। বহু জনহিতকর কাজে অর্থ দান করেছেন। কলকাতা পৌরসভায় প্রতিনিধি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য, কলকাতার মেয়র প্রভৃতি পদ অলংকৃত করেন বিভিন্ন সময়ে।

৩৫ **নীতিন্দ্রমোহন বসু (১৮৯৭-১৯৫৫)** প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, ক্যামেরাম্যান এবং শব্দযন্ত্রী বিখ্যাত নীতিন বসু নামে। ১৯২১-এ তাঁর তোলা পুরীর রথযাত্রার ছবি নিউইয়র্কের একটি সংস্থা কিনে

নেয়। নিউ থিয়েটার্সের শুরু থেকে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম পরিচালিত ছবি 'চণ্ডীদাস'। তার আগে ক্যামেরার কাজ করতেন। মুম্বাইতে গিয়ে বেশ কয়েকটি বাণিজ্যসফল হিন্দি ছবি পরিচালনা করেন। ১৯৭৮-এ তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ছায়াছবির গানে প্লে-ব্যাক প্রথার প্রচলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

৩৬ **পাটনকার** দাদাসাহেব ফালকের প্রায় সমসাময়িক এম. এল. পাটনকার চাকরি করতেন করোনেশন সিনেমায়। পরে চার বন্ধুর সঙ্গে ১৯১৪-এ 'সত্যবান সাবিত্রী' ছবি এবং আরও কয়েকটি ছবি প্রযোজনার পর দ্বারকাদাস নারায়ণদাস সম্পতের আর্থিক সহায়তায় 'পাটনকার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কোম্পানি' তৈরি করেন। কিছুদিন পর দ্বারকাদাসের সঙ্গে সম্পর্ক উচ্ছেদ হলে একাই ছবি প্রযোজনা চালিয়ে যান। তখন নতুন সংস্থার নাম হয় ন্যাশনাল ফিল্ম কোম্পানি। পাটনকার নিজে অভিনয়ও করেছেন। 'মহাশ্বেতা কাদম্বরী' (১৯২২) ছবিতে পুণ্ডরীক, 'বিদেহী জনক' (১৯২৩) ছবিতে রাজা জনক এবং 'বামন অবতার' (১৯২৬) ছবিতে রাজা বলী-র ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি। 'ন্যাশনাল ফিল্ম' বন্ধ হলে পায়োনিয়ার ফিল্ম কোম্পানির জন্য ছ-টি ছবি পরিচালনা করেন পাটনকার। ১৯১২ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত পাটনকার অন্তত ছত্রিশটি ছবির পরিচালনা এবং চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব সামলেছেন।

৩৭ **পিলে** জয়গোপাল পিল্লাই। পুনর্জন্ম ছবির পরিচালক। এ ছাড়া পরিচালনা করেছেন ইংরেজি টাইটেল সংবলিত 'অবলা' বা 'দ্য

অরফ্যান গার্ল' (১৯৩১)। 'কুমকুম' (১৯৪০) ছবির সিনেম্যাটোগ্রাফার ছিলেন পিল্লাই।

৩৮ **পিয়ের লোটি (১৮৫০-১৯২৩)** ফরাসি নৌ-বাহিনির অফিসার এবং ঔপন্যাসিক পিয়ের লোটি-র আসল নাম জুলিয়েন ভিয় (Julien Viaud)। ১৮৯৯ এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভ্রমণে এসে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেন ১৯০৩-এ প্রকাশিত 'ল'ইন্ডে সঁ লে আংলে' (India, without the English) গ্রন্থে।

৩৯ **প্রফুল্ল ঘোষ** অহীন্দ্র চৌধুরীর অকৃত্রিম বন্ধু প্রফুল্ল ঘোষ ছিলেন অহীন্দ্রবাবুর বাবার বিশেষ স্নেহভাজন। অহীন্দ্রবাবুর ফোটো প্লে সিন্ডিকেট গড়ে তুলতে তাঁকে প্রচুর সহায়তা করেছিলেন প্রফুল্লবাবু। প্রথম জীবনে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির পরিদর্শকের চাকরি করতেন প্রফুল্ল ঘোষ। থিয়েটারপাড়ায় কাজে এসে আলাপ-পরিচয় তৈরি করে কোহিনুর থিয়েটারে ঢুকে পড়েন। ছোটোবেলা থেকেই আকৃষ্ট ছিলেন থিয়েটারের প্রতি। সেখানে ছোটোখাটো ভূমিকায় অভিনয় করতেন এবং নাচ শিখে নিয়ে অংশ নিতেন সমবেত নৃত্যে। বার্ড কোম্পানির মুঙ্গেরের অভ্র খনিতে এবং পরে কলকাতার এক অফিসে হিসাবরক্ষক বা বড়োবাবুর কাজ করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং তার কিছু পরেও। ১৯২১ সালে অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে ফোটো প্লে সিন্ডিকেট তৈরির পর চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ওই সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রফুল্ল ঘোষ ম্যাঙ্গালোর চলে যান এবং কুকা সিজুয়ার সিনেমা হাউসের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালে।

৪০ **প্রফুল্লকুমার রায় (১৮৯১-১৯৭১)** কলেজের পড়া শেষ করে স্নাতক হওয়ার পর নাট্যপ্রীতির টানে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সান্নিধ্যে আসেন। ১৯২৪-এ শিশিরকুমার, প্রফুল্লবাবুকে সুযোগ দেন 'সীতা' নাটকে শম্বুক নামক চরিত্রে অভিনয়ের। চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু 'লাইট অব এশিয়া' ছবিতে দেবদত্তর ভূমিকায় অভিনয় দিয়ে। এ ছাড়া 'দ্য লাভ অব আ মুঘল প্রিন্স' এবং 'দ্য থ্রো অব ডাইস' ছবিতে অভিনয় করেন। শেষোক্ত ছবিতে তিনি ছিলেন সহকারী নির্দেশক। 'চাষার মেয়ে' এবং 'অভিষেক' নামে দুটি নির্বাক ছবি পরিচালনা করেছিলেন প্রফুল্লকুমার রায়। তাঁর প্রথম সবাক ছবি 'চাঁদসদাগর' (১৯৩৪)। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি সবাক বাংলা ছবি এবং কয়েকটি হিন্দি এবং উর্দু ছবিও তিনি পরিচালনা করেন।

৪১ **প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী** সংক্ষেপে পি. এন. গাঙ্গুলী, ম্যাডান কোম্পানিতে টাইপিস্টের কাজ করতেন। শেষপর্যন্ত তিনি পরিণত হলেন চলচ্চিত্র পরিচালকে। এক সময়ে ম্যাডান কোম্পানি প্রযোজিত ছবিগুলির মধ্যে তাঁর পরিচালিত ছবিগুলিই সব থেকে বেশি জনপ্রিয় বিবেচিত হতো। ১৯৩২-এ প্রিয়নাথ, ম্যাডান কোম্পানি ছেড়ে যোগ দেন ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানিতে। সেখানে তাঁর তৈরি প্রথম ছবি 'যমুনা পুলিনে'। এটি সবাক ছবি। ১৯৩৫-এ তিনি নিজস্ব সংস্থা 'ইন্ডিয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ' স্থাপন করেন। পরে প্রিয়নাথবাবুর অকালমৃত পুত্র কালীধনের স্মৃতিতে এই সংস্থার নাম 'কালী ফিল্মস কোম্পানি' রাখা হয়।

৪২ **ফতেলাল** মহারাষ্ট্র ফিল্ম কোম্পানির আদিকাল থেকে বাবুরাও পেন্টারের সহযোগী ছিলেন দামলে এবং ফতেলাল। এঁরা দুজন

যৌথভাবে প্রভাত ফিল্ম কোম্পানির 'সন্ত তুকারাম', 'সন্ত জ্ঞানেশ্বর', 'সন্ত সখু' এবং মহারাষ্ট্র ফিল্ম-এর 'কর্ণ' পরিচালনা করেন। প্রভাত ফিল্ম-এর সেট নির্মাণ এবং শিল্পের বিষয়টি ফতেলাল দেখতেন। ১৯৬৪ সালে ফতেলালের মৃত্যু হয়। প্রভাত ফিল্ম কোম্পানি অবশ্য তার আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

৪৩ **ফেয়ারব্যাঙ্কস (১৮৮৩-১৯৩৯)** ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস-কে বলা হতো 'কিং অব হলিউড'। তিনি প্রধানত অভিনেতা হলেও প্রযোজক, পরিচালক এবং চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসেবেও সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন হলিউডের নির্বাক যুগের ছবিতে। ইউনাইটেড আর্টিস্টস এবং দ্য মোশন পিকচার্স অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ফেয়ারব্যাঙ্কস ১৯২৯ সালে প্রথম 'অস্কার প্রদান' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অভিনয়জগতে আগমনের আগে তাঁর নাম ছিল ডগলাস এলটন থমাস উলমান। ফেয়ারব্যাঙ্কস ছিল তাঁর মা-র প্রথম স্বামীর পদবি। ১৯২০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস এবং মেরি পিকফোর্ড ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। তাঁর অভিনীত নির্বাক যুগের বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে 'দ্য থিফ অব বাগদাদ', 'দ্য মার্ক অব জোরো', 'রবিনহুড', 'ইনটলার‍্যান্স' 'হেডিন সাউথ', 'দ্য থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', 'দ্য প্রাইভেট লাইফ অব ডন জুয়ান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪৪ **ফ্রামজি মদন** জে. এফ. ম্যাডানের পুরো নাম জামশেদজি ফ্রামজি ম্যাডান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পাঁচ পুত্রের একজন, জাহাঙ্গীর ম্যাডান (জে. জে. ম্যাডান) কোম্পানির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীর ম্যাডান পরিচালিত নির্বাক ছবিগুলির মধ্যে 'কৃষ্ণ সুদামা'

(১৯২২), 'লায়লা মজনু' (১৯২২), 'পতিভক্তি' (১৯২২), 'নুরজাহান' (১৯২৩), 'পত্নীপ্রতাপ' (১৯২৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লেখক সম্ভবত জাহাঙ্গির মদনের নাম ভুলবশত 'ফ্রামজি' লিখেছেন।

৪৫ **বাবুরাও পেন্টার (১৮৯০-১৯৫৪)** বাবুরাও কৃষ্ণরাও মেস্ত্রি পরিচিত ছিলেন বাবুরাও পেন্টার নামে। ভারতীয় সিনেমার আদিযুগের এই নির্দেশকের জন্ম কোলহাপুর শহরে। ফিল্ম স্টুডিয়োর সিন আঁকতেন। সেই থেকে 'পেন্টার' পদবির উদ্ভব। কিছু পরিচিত মানুষের অর্থানুকূল্যে মহারাষ্ট্র ফিল্ম কোম্পানি স্থাপন করেন ১৯১৯ সালে। দামলে, ফতেলাল, শান্তারাম প্রমুখের সিনেমাজগতে হাতেখড়ি হয়েছিল বাবুরাওয়ের কাছেই। বাবুরাওয়ের প্রথম ছবি 'সৈরিন্ধ্রি' (১৯২০)। বাবুরাও ছবি এঁকে চিত্রনাট্য তৈরির যে-পদ্ধতি ব্যবহার করতেন, পরবর্তী যুগে সের্গেই আইজেনস্টাইন তাঁর নামকরণ করেছিলেন 'স্টেনোগ্রাফিক'। সত্যজিৎ রায়ও এইভাবে চিত্রনাট্য তৈরি করতেন। বাবুরাও ছিলেন সবাক ছবির বিপক্ষে। নির্বাক ছবি নিয়ে থাকতে পছন্দ করলেও পরবর্তীকালে কয়েকটি সবাক ছবি তিনি পরিচালনা করেন। নিজে অভিনয়ও করেছিলেন 'কল্যাণ খাজিনা' (১৯২৪) এবং 'সিংগড়' (১৯২৩) ছবিতে। ছবির পোস্টার অঙ্কনেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন বাবুরাও। শিল্পনির্দেশনা, কাহিনি-বিন্যাস, পরিচালনা, ক্যামেরা প্রভৃতি সব ধরনের কাজে পারদর্শী বাবুরাও পেন্টার নিজের পরিচয় দিতেন সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে।

৪৬ **বাহালবা পেন্টারকার** ভালজি পেন্টারকার এবং বাবুরাও পেন্টারকার ছিলেন ভি. শান্তারামের তুতোভাই। তাঁরা ছিলেন মহারাষ্ট্র

ফিল্ম কোম্পানির কর্মচারী, শান্তারামকে তাঁরাই নিয়ে আসেন ওই কোম্পানিতে। ভালজির আসল নাম ভালচন্দ্র গোপাল পেন্টারকার। তিনি 'সিনেমা সমাচার' নামে একটি পত্রিকা চালাতেন।

৪৭ **বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)** প্রসিদ্ধ দেশনেতা এবং বক্তা। ছাত্রাবস্থায় শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রেরণায় ব্রাহ্ম হন। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। অরবিন্দ ঘোষের মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে কারাদণ্ড ভোগ করেন৭ দ্বিতীয় বার ইংল্যান্ডে গিয়ে 'স্বরাজ' এবং 'ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯১২ সাল থেকে লেখাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। ব্রিটিশবিরোধী লেখার জন্য কারাবরণ করতে হয়। ১৯১৬-এ বালগঙ্গাধর তিলকের হোমরুল মুভমেন্টে যোগ দেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন তিলক এবং লাজপৎ রায়ের অনুগামী সহকর্মী এবং চরমপন্থী 'লাল-বাল-পাল'-এর অন্যতম। নানাবিধ পত্রিকা সম্পাদনা করেন বিভিন্ন সময়ে এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ না করলেও শেষজীবনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব সাধনমার্গ অবলম্বন করেন।

৪৮ **বীরেন্দ্রনাথ সরকার (১৯০১-১৯৮০)** কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস.সি. এবং লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে যুক্ত ছিলেন মার্টিন কোম্পানির সঙ্গে। কোম্পানির পক্ষে সিনেমা হাউস তৈরির দায়িত্ব পেলে নিজেরও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের ইচ্ছা হয়। ১৯৩০ সালে চিত্রা এবং নিউ সিনেমা তৈরি করেন, সেইসঙ্গে গঠন করেন ছায়াছবি প্রযোজক সংস্থা

ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট। ১৯৩১-এ প্রতিষ্ঠা করেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়ো। প্রযোজনা করেছেন দেড়শোরও বেশি ছবি। তার মধ্যে বাংলা ছাড়া কয়েকটি হিন্দি ও তামিল ছবিও আছে। চীন এবং আমেরিকায় ভারত সরকার প্রেরিত চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধি এবং দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রমথেশ বড়ুয়া স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন।

৪৯ ভাওনানি (১৯০৩-১৯৬২) ভাওনানির জন্ম সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদ শহরে। তাঁর পরিচালিত প্রথম দিকের তথ্যচিত্রগুলির মধ্যে হিমালয়ান টেপেস্ট্রি, অপারেশন খেদা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫০ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯৬৬) পরবর্তী যুগের বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৩) চিত্রজগতে 'ছোটো' এবং এই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় 'বড়ো' নামে পরিচিত। বড়ো ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি 'লাইট অব এশিয়া' হলেও অনেকের মতে বাংলা টাইটেলযুক্ত ছবি 'নিষিদ্ধ ফল' তাঁর প্রথম ছবি। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সবাক ছবি 'দেনাপাওনা' তাঁরও প্রথম সবাক ছবি। তাঁর অভিনীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সবাক ছবি 'রজত জয়ন্তী', 'জীবন মরণ', 'নার্স দিদি', 'নর্তকী', 'অঞ্জনগড়', 'পুষ্পধনু', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি।

৫১ ভাস্কর বাগলা (১৪৮৯-১৯২২) ভাস্কর রঘুনাথ বাখালে বা ভাস্করবুয়া বাখালে ছিলেন বিখ্যাত হিন্দুস্তানি সংগীতশিল্পী। কির্লোস্কর নাটক মণ্ডলীর সদস্য বাখালে 'রামরাজ্যবিয়োগ' নাটকে স্ত্রী-ভূমিকায়

মন্থরা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এককভাবে এবং গোবিন্দরাও তাম্বের সঙ্গে যৌথভাবে কয়েকটি নাটকের সংগীত রচনা করেন তিনি।

৫২ মধু বসু (১৯০০-১৯৬৯) প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসুর পুত্র মধুর পোশাকি নাম সুকুমার। শান্তিনিকেতন এবং বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াশোনা, বি. এস.সি. পাশ করে অভিনয়জগতে আগমন। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কলকাতা আর্ট প্লেয়ার্স নামক নাট্যসংস্থা গঠন করে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেন। ১৯২৪-এ ম্যাডান কোম্পানির একটি ছবিতে প্রথম ছায়াছবির অভিনয়। ১৯২৫-এ অভিনয় 'লাইট অব এশিয়া' ছবিতে। সেইসঙ্গে প্রোডাকশন বিভাগে কাজও পেলেন। এরপর রেঙ্গুন এবং লন্ডনে কাজ নিয়ে চলে যান। লন্ডনে সুযোগ হয় অ্যালফ্রেড হিচকক-এর সংস্পর্শে আসবার। ১৯২৮-এ দেশে ফিরে এসে প্রথমে মঞ্চাভিনয় এবং তারপর ছায়াছবি পরিচালনার ও সহকারীর কাজ শুরু করেন। সেইসঙ্গে ছবিতে অভিনয়ও করতেন। ১৯২৯-এ 'দ্য থ্রো অব আ ডাইস' ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯৩০-এ পরিচালনা করেন নির্বাক ছবি 'গিরিবালা'। তাঁর পরিচালিত 'আলিবাবা' (১৯৩৭) ছবিতে তিনি আবদুল্লা এবং তাঁর স্ত্রী বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু মর্জিনার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এটি সবাক ছবি। শেষ পরিচালিত ছবি 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (১৯৬৪)।

৫৩ মহারানা ফতে সিং (১৮৮৫-১৯৩০) মহারানা ফতে সিং ছিলেন উদয়পুর বা মেবারের রানা বংশের সিংহাসনের অধিকারী।

৫৪ মেরি পিকফোর্ড (১৮৯২-১৯৭৯) হলিউডের এই সুন্দরী অভিনেত্রীর জন্ম কানাডার টরোন্টো শহরে। ইউনাইটেড আর্টিস্টস-

এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং অস্কার পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থা অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার্স, আর্টস অ্যান্ড সাইন্সেজ-এর ৩৬জন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যর একজন। তাঁর সৌন্দর্যর জন্য তাঁকে বলা হতো 'আমেরিকা'স সুইট হার্ট'। এ ছাড়া 'লিটন মেরি' এবং 'দ্য গার্ল উইথ দ্য কার্লস' নামেও খ্যাত ছিলেন তিনি। মোট ৫২টি কাহিনিচিত্রে মেরি পিকফোর্ড অভিনয় করেন। তার মধ্যে বেশ কয়েকটিতে তাঁর চরিত্র ছিল বাচ্চা মেয়ের। যেমন 'দ্য প্যুওর লিটল রিচ গার্ল' (১৯১৭), 'রেবেকা অব সানিব্রুক পার্ক' (১৯১৭), 'ড্যাডি-লং-লেগস' (১৯১৯) প্রভৃতি। ১৯২৯ সালে মেরি পিকফোর্ড প্রথম কোনো সবাক ছবিতে অভিনয় করেন। ছবির নাম ছিল 'ককেট'। জীবনে তিন বার বিয়ে করেছিলেন পিকফোর্ড। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস।

৫৫ ম্যানেল্লি এই ইতালীয় অভিনেতা খ্যাত ছিলেন মাস্টার মোনালি নামে। তাঁর সম্পূর্ণ নাম সেনর পি. ম্যানেল্লি। তাঁর স্ত্রী সেনেরিন এফ. ম্যানেল্লিও অভিনয় করতেন। তাঁর পরিচিতি ছিল মিসেস মোনালি নামে। সেনর পি. ম্যানেল্লি ১৯২১-এর ডার্বি স্যুইপের তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথমদিকের ছবিগুলির মধ্যে ধ্রুবচরিত্র, নলদময়ন্তী, শিবরাত্রি, পতিভক্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫৬ যোগেন বসু (১৮৫৪-১৯০৫) চুঁচুড়ার 'সাধারণী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গবাসী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করেন ১৮৮১ সালে। ব্রিটিশবিরোধী লেখার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। পরে হিন্দি 'বঙ্গবাসী' এবং ইংরেজি 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকা

প্রকাশ করেন। বহু শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এবং দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ তাঁর বিশেষ কীর্তি। ‘নেড়া হরিদাস’, ‘মডেল ভগিনি’, ‘কালাচাঁদ’, ‘চিনিবাস চরিতামৃত’ প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ।

৫৭ **যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৪২)** প্রখ্যাত নাট্যকার। মঞ্চ ও ছায়াছবির জগতে আগমন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে অভিনয় দিয়ে। শিশিরকুমারের নাট্যদলের সঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ‘সীতা’ ছাড়া তাঁর রচিত ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’, ‘পরিণীতা’, ‘দিগ্বিজয়ী’, ‘নন্দরাণীর সংসার’, ‘মহামায়ার চর’ প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। নির্বাক ছবি ‘আঁধারে আলো’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘বিচারক’ প্রভৃতিতে অভিনয় কবেন। প্রথম সবাক ছবিতে অভিনয় ‘পল্লীসমাজ’-এ (১৯৩২)।

৫৮ **রুডলফ ভ্যালেনটিনো (১৮৯৫-১৯২৬)** ইতালীয় অভিনেতা রুডলফ ভ্যালেনটিনো পরিচিত ছিলেন ‘ল্যাটিন লাভার’ নামে এবং তাঁর অনুরাগীদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। ভ্যালেনটিনো ছিলেন নির্বাক ছায়াছবির নায়ক। তাঁর অভিনীত ‘দ্য শেখ’ এবং ‘দ্য ফোর হর্সমেন অব দ্য অ্যাপোক্যালিপস’ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছায়াছবি। স্টুডিয়ো এবং প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়ে মতবিরোধের কারণে কিছুদিন অভিনয় থেকে সরে আসেন রুডলফ। সেইসময় তিনি মিনারেলাভা কোম্পানি আয়োজিত নৃত্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিভিন্ন শহরে ঘুরে নৃত্যানুষ্ঠান করতেন। তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবির মধ্যে ‘দ্য ম্যারেড ভার্জিন’ (১৯১৮), ‘স্টোলেন মোমেন্টস’ (১৯১৯), ‘কামিল’ (১৯২১), ‘আ সেন্টেড ডেভিল’ (১৯২৪), ‘দ্য ইগল’ (১৯২৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাত্র ৩১ বছর বয়সে বিভিন্ন রোগের

কারণে ভ্যালেনটিনোর মৃত্যু হলে নিউইয়র্ক শহরে তাঁর 'ফিউনেরাল' অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন।

৫৯ **রুস্তমজি ধোতিওয়ালা** জে. এফ. ম্যাডানের দক্ষিণ হস্ত এবং বিভিন্ন অন্য ব্যাবসার ম্যানেজার ছিলেন রুস্তমজি। ম্যাডান কোম্পানির তোলা ছবিগুলি পরিচালনার দায়িত্ব পান ম্যাডান সাহেবের পরম বিশ্বস্ত এই কর্মচারী। বাংলা দেশে তৈরি প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র 'বিল্বমঙ্গল'-এর পরিচালক ছিলেন রুস্তমজি ধোতিওয়ালা। এ ছাড়া তিনি 'মহাভারত' ছবিটিও পরিচালনা করেন।

৬০ **লন চ্যানি** নির্বাক যুগের মার্কিন অভিনেতা লন চ্যানি সিনিয়রকে বলা হতো 'দ্য ম্যান অব আ থাউজ্যান্ড ফেসেস'। ১৮৮৩ সালে কলেরেডো স্প্রিংস শহরে জন্ম। 'হাঞ্চব্যাক অব নৎরদম' ছবিতে কোয়াসিমোদো এবং 'দ্য ফ্যান্টম অব দি অপেরা' ছবিতে ফ্যান্টম এরিকের ভূমিকায় চ্যানির অভিনয় দর্শকদের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। 'দ্য আননোন' (১৯২৭), 'দ্য আনহোলি থ্রি', 'দ্য পেনাল্টি' প্রভৃতি ছবিতেও তিনি অসাধারণ অভিনয় করেন। ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩০ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেন লন চ্যানি।

৬১ **শান্তারাম (১৯০১-১৯৫৯)** ভি. শান্তারাম নামে পরিচিত এই জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা, নির্দেশক এবং অভিনেতার পুরো নাম শান্তারাম রাজারাম ভনকুদরে। বাবুরাও পেন্টারকার এবং বালাজি পেন্টারকার ছিলেন শান্তারামের তুতোভাই। এঁরা শান্তারামকে মহারাষ্ট্র ফিল্ম কোম্পানিতে শিক্ষানবিশ হিসেবে নিয়ে আসেন। কয়েক দিনের

মধ্যেই তিনি 'বৎসলা হরণ' ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান। মহারাষ্ট্র ফিল্ম কোম্পানিতে নানাবিধ কাজ করে অবশেষে ১৯২৯-এ ওই সংস্থা ছেড়ে ধাইবার, ধামলে এবং ফতেলাল-এর সঙ্গে প্রভাত ফিল্ম কোম্পানি স্থাপন করেন। বাবুরাও পেন্টার নির্দেশিত কয়েকটি নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেন শান্তারাম। পরে প্রভাত ফিল্ম-এর জন্যও কয়েকটি নির্বাক ছবি তৈরি করেন। সেই সময়ে অভিনয় করা কমিয়ে দিয়ে পরিচালনার দিকেই মন দেন তিনি। ১৯৪২-এ প্রভাত ফিল্ম ছেড়ে দিয়ে শান্তারাম নিজস্ব সংস্থা 'রাজকমল কলা মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৫-তে 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার এবং ১৯৯২-এ মরণোত্তর 'পদ্মবিভূষণ' খেতাবে ভূষিত হন শান্তারাম।

৬২ **শান্তি গুপ্তা (১৯১০-১৯৭৩)** মঞ্চাভিনয় দিয়ে অভিনয়জীবনের শুরু। প্রথম ছায়াছবিতে অভিনয় ম্যাডান কোম্পানির 'কপালকুণ্ডলা'য়। অবশ্য খ্যাতি অর্জন করেন 'কাল পরিণয়', 'কেরাণির মাসকাবার', 'গিরিবালা' এবং 'চোরকাঁটা' ছবিতে অভিনয় করে। বেশ কয়েকটি সবাক ছবিতেও কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। নিয়মিত অভিনয় করতেন বিভিন্ন পেশাদারি মঞ্চে।

৬৩ **শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯)** এম. এ. পাশ করেন ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। তারপর অধ্যাপনা করতেন। সেই সময়ে তাঁর শৌখিন অভিনয় রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করে। ১৯২১-এ 'আলমগীর' নাটকে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন পেশাদারি রঙ্গালয়ে। ম্যাডান কোম্পানির নাটকে চাণক্য, রঘুবীর প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করেন। মতের অমিল হওয়ায় ম্যাডান থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে নতুন

নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করে 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করতে শুরু করেন 'অ্যালফ্রেড থিয়েটার'-এ। এটি বর্তমানের 'গ্রেস' সিনেমা। আরও পরে মনোমোহন থিয়েটার লিজ নিয়ে 'নাট্যমন্দির' সংস্থা স্থাপন করেন। প্রথমে তাঁর বিপরীতে প্রভা দেবী এবং পরে তারাসুন্দরী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। পরে কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে নতুন কোম্পানি গড়ে নাট্যাভিনয় করেন। ১৯৩০-এ অর্থের অভাবে নাট্যমন্দির ছেড়ে সদলে স্টার থিয়েটারে যোগ দিতে বাধ্য হন। নাটকের দল নিয়ে অভিনয় করতে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন শিশিরকুমার, তবে আর্থিক লাভ হয়নি, বরং ক্ষতিই হয়েছিল সে-যাত্রায়। পরবর্তী যুগে শ্রীরঙ্গম থিয়েটারে কিছুদিন অভিনয় করেছিলেন। শিশিরকুমার ছিলেন প্রধানত মঞ্চাভিনেতা। তাঁকে বলা হতো 'নাট্যাচার্য'। ম্যাডান থিয়েটারের 'মোহিনী' (১৯২২), তাজমহল ফিল্মের 'আঁধারে আলো' (১৯২২) ইত্যাদি কয়েকটি নির্বাক ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত সবাক ছবিগুলির মধ্যে 'সীতা', 'পল্লীসমাজ', 'চাণক্য' 'টকী অব টকীজ', 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

৬৪ **সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৪৪)** দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম 'বসুমতী' সংবাদপত্র প্রকাশ করা ছাড়াও তাঁর উদ্যোগে বহু বিখ্যাত বাংলা সাহিত্য সুলভ মূল্যের সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' থেকে। তিনি ছিলেন ওই সংস্থার মালিক তথা প্রতিষ্ঠাতা।

৬৫ **সিসিল বি ডি'মিলো (১৮৮১-১৯৫৯)** নির্বাক ও সবাক চলচ্চিত্রের আমেরিকান পরিচালক। 'ক্লিয়োপেট্রা' (১৯৩৪), 'দ্য

গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' (১৯৫২), 'দ্য টেন কম্যান্ডমেন্টস' (১৯৫৬) -এর মতো অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী ছবির পরিচালক জীবন শুরু করেন ব্রডওয়ের একটি সংস্থার সাধারণ অভিনেতা হিসেবে। চিত্রজগতে আগমন ১৯৩৩ সালে। 'দ্য স্কো ম্যান' (১৯১৪), 'ডোন্ট চেঞ্জ য়োর হাজব্যান্ড' (১৯১৯), 'দ্য টেন কম্যান্ডমেন্টস', 'দ্য কিং অব কিংস' (১৯২৭) প্রভৃতি নির্বাক ছবির সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। বাইবেল-এর কাহিনি এবং বিভিন্ন প্রাচীন গাথার বিষয় সংক্রান্ত ছবি করতেন সিসিল বি ডি'মিলো। তাঁর বিশেষত্ব ছিল একসঙ্গে হাজার হাজার 'একস্ট্রা' অভিনেতা নিয়ে কাজ করা। 'দ্য টেন কম্যান্ডমেন্টস'-এর রেড সি দু-ভাগ হওয়ার দৃশ্য, 'দ্য রোড টু ইয়েসটারডে' ছবিতে ট্রেন দুর্ঘটনা, 'মাদাম স্যাটান' ছবিতে উড়োজাহাজ জেপেলিন-এর ভেঙে পড়া প্রভৃতি দৃশ্য আজও চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

৬৬ **সীতা দেবী** এঁর আসল নাম রিনি স্মিথ। কলকাতার কিড স্ট্রিটের বাসিন্দা নিরঞ্জন পালের দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখে অভিনয় করতে আগ্রহী হন এবং অতি অল্প বয়সে 'লাইট অব এশিয়া' ছবিতে গোপার ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পান। ছবির বিজ্ঞাপনে তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল 'রক্ষণশীল অভিজাত বংশীয়া হিন্দু পরিবারের বিদুষী কন্যা সীতা দেবী'। তাঁর অভিনীত প্রথম বাংলা ছবি 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। এগুলি ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি নির্বাক ও সবাক ছবিতে অভিনয় করেন।

৬৭ **স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫)** ১৮৬৯-এ বিলেত গিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করলেও বয়সের কারণ দেখিয়ে

তাঁকে আটকে দেওয়া হয়। অতঃপর আদালতের নির্দেশে তালিকাভুক্ত হন। ১৮৭১-এ দেশে ফেরার পর শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৭৩-এ এক চক্রান্তের ফলে পদচ্যুত হন সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৭৬-এ বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে নিজ-প্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজে শিক্ষকতা করতে থাকেন। বর্তমানে এটি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। বাংলার নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথিকৃৎ সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা পুরসভার সদস্য, কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের সদস্য, 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সাংবাদিক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পরে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ইংরেজ শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করেন এবং ব্রিটিশদের থেকে 'স্যার' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৯২৩-এ রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

৬৮ **হরেন ঘোষ (১৮৯৫-১৯৪৭)** 'ইম্প্রেসারিও' পেশায় এ-দেশে পথিকৃৎ ছিলেন হরেন ঘোষ। বিদেশে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে বাংলা দেশের সংস্কৃতি প্রচার এবং প্রসারের কাজে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য! 'আর্য ফিল্মস' নামক কোম্পানি খুলে 'বুকের বোঝা' ছবিটির প্রযোজনা করেন। তাঁকে কেন্দ্র করে আসর জমাতেন সে-যুগের চলচ্চিত্র ও অভিনয়শিল্পের দিক্‌পাল মানুষরা। সেই আসরে দানা বাঁধত বহু বিশাল পরিকল্পনা। নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর এই হরেন ঘোষেরই আবিষ্কার মনে করা হয়। নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন দেশের ও বিদেশের বহু শহরে। 'নাচঘর' পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্বভার

সামলেছেন বেশ কিছু সময়। সাতচল্লিশ সালের ধর্মীয় দাঙ্গায় নৃশংসভাবে খুন হন এই জনপ্রিয় মানুষটি।

৬৯ **হিমাংশু রায় (১৮৯২-১৯৪০)** ১৯৩৪ সালে টকিজ প্রতিষ্ঠা করবার আগে 'সিরাজ', 'দ্য থ্রো অব আ ডাইস', 'কর্মা', 'লাইট অব এশিয়া' প্রভৃতি নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেন। প্রযোজনা করেছেন বেশ কয়েকটি সবাক ও নির্বাক ছবি। ত্রিশের দশকের জনপ্রিয় ছবি 'অচ্ছুৎ কন্যা'র কাহিনি এবং চিত্রনাট্য হিমাংশু রায়ের রচনা। বিখ্যাত অভিনেত্রী দেবিকারাণী ছিলেন তাঁর স্ত্রী।

৭০ **হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭)** বাংলায় ছায়াছবি প্রদর্শনের পথিকৃৎ হীরালাল সেন ১৮৯৮ সালে রয়্যাল বায়োস্কোপের প্রতিষ্ঠা করেন। ছবি দেখাতেন আর্ক ল্যাম্পের সাহায্যে। ১৯০১ সাল থেকে বিভিন্ন নাটকের দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত করতে শুরু করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সভার দৃশ্য চিত্রায়িত করেন ১৯০৫ সালে। 'হল কী' নাটকের সঙ্গে সেই চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। পরে রয়্যাল বায়োস্কোপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন কুমারশঙ্কর গুপ্তর 'লন্ডন বায়োস্কোপ'-এ কাজ করেন হীরালাল। আরও পরে রাম দত্তর সঙ্গে একত্রে ব্যাবসাতে নামেন তিনি। উত্তর কলকাতায় 'শো হাউস' (বর্তমানে 'গণেশ টকীজ') নামক প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন করেন। হীরালালের মৃত্যুর কিছুদিন পরে এক অগ্নিকাণ্ডে তাঁর সারাজীবনের তোলা ছবি, যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা, সরঞ্জাম সব পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

বিবিধ

১ **বঙ্গবাসী পত্রিকা** প্রথম প্রকাশিত হয় ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১ সালে, এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রধান সহায়ক ছিলেন বন্ধু উপেন্দ্রনাথ সিংহরায়। প্রথম সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। এই পত্রিকা ছিল প্রাচীনপন্থী মনোভাবাপন্ন। নতুন যেকোনো সামাজিক ঘটনা বা প্রথার প্রতি শ্লেষ প্রকাশ করা এই পত্রিকার এক বৈশিষ্ট্য মনে করা হতো।

২ **বসুমতী** সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকা প্রথম প্রকাশের তারিখ হল আঠারোশো ছিয়ানব্বইয়ের পঁচিশে আগস্ট। ব্যোমকেশ মুস্তফি ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। বিনামূল্যে নানা পুস্তক, ছবি ইত্যাদি দিয়ে পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানোর বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হতো পত্রিকার তরফ থেকে। কোনো বাংলা পত্রিকার পক্ষে এই ধরনের রীতি প্রয়োগ বসুমতীই প্রচলন করে।

৩ **ভারতী** এই পত্রিকার পরিকল্পনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ মাসে। চলেছিল ১৩৩৩-এর আশ্বিন মাস পর্যন্ত। প্রথম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পরে ঠাকুরবাড়ির অনেকে, এমনকী রবীন্দ্রনাথও বিভিন্ন সময়ে এটির সম্পাদনা করেছেন। পত্রিকার শেষদিকে এটি চালানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী একদল তরুণ সাহিত্যিক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম: মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ।

৪ **মুহূর্ত-কা-শিকার** এই নামের এক অনুষ্ঠানের অছিলায় রানা এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের শিকার করতে যাওয়ার খেলা। এই শিকার উৎসবে রানা ও পরিবারের পুরুষ সদস্যরা মৃগয়ায় গিয়ে যে-যার শিকারের পারদর্শিতা এবং পরাক্রমের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন। সেইসঙ্গে চলত অফুরন্ত পানভোজনের বিলাস। স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারি আইনে বন্যপ্রাণী শিকার বন্ধ করে দেওয়ার পর এই উৎসব বন্ধ হয়েছে।

৫ **শ্রবণকুমারের গল্প** পিতৃ ও মাতৃভক্ত শ্রবণকুমার অর্থের অভাবে একটি বাঁকের দুই প্রান্তে ঝোলানো ডুলিতে বাবা এবং মাকে বসিয়ে, সেই বাঁক কাঁধে করে হেঁটে হেঁটে বাবা-মাকে তীর্থভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেশের প্রথম সবাক ছবি শ্রবণকুমারের গল্প নিয়ে নয়, হয়েছিল পারসি নাট্যকার যোসেফ ডেভিড-এর লেখা কল্পিত রাজ্য কুমারপুরের রাজা, তাঁর দুই রানি দিলবাহার এবং নববাহার, দিলবাহারের প্রণয়ী, প্রধানমন্ত্রী আদিল এবং আদিলের কন্যা আলম আরা-র কাহিনি নিয়ে। ছবির নাম 'আলম আরা', অর্থ— পৃথিবীর আলো। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৩১-এ। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন মাস্টার ভিট্টল, নায়িকা জুবেইদা। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, ওয়াজির মহম্মদ খান, এল. ভি. প্রসাদ, জগদীশ শেঠ্ঠী প্রমুখ। পরিচালক আর্দেশির ইরানি। ছবিটিতে ছিল সাতটি গান।

৬ **সিসিল বি ডি'মিলোর বড়ো বড়ো ছবি** বহু সংখ্যক 'একস্ট্রা' অভিনেতা নিয়ে ছবির বিভিন্ন দৃশ্য চিত্রায়িত করতেন সিসিল বি ডিমিলো। সেই ছবিগুলির দৈর্ঘ্যও যেমন বড়ো হতো, তেমনিই হতো

তাদের দৃশ্য, অভিনেতার সংখ্যা, কাহিনিবিন্যাস প্রভৃতি। এই ধরনের দৃশ্যের উদাহরণস্বরূপ 'দ্য টেন কম্যান্ডমেন্টস' ছবিতে রেড-সি দু-ভাগ'হওয়া, স্যামসন ডিলাইলা ছবিতে মন্দির ভেঙে পড়ার দৃশ্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

আলোকচিত্র

আলোকচিত্রের পরিচিতি